চারটি মহামূল্যবান বয়ান

চোখ ও যবানের হেফাযত করুন
হিংসা ও গোস্বা পরিহার করুন

মূল
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদীআরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
সিনিয়র মুদাররিস : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
খতীব : লেকসার্কাস জামে মসজিদ কলাবাগান, ঢাকা

প্রকাশনায়
দারুল কুতুব
[মননশীল ধর্মীয় গ্রন্থের অভিজাত প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান]
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

চোখ ও যবানের হেফাযত করুন
হিংসা ও গোস্বা পরিহার করুন

মূল : শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান

প্রকাশনায়
দারুল কুতুব
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশকাল
রজব ১৪৪৪ হিজরী
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত]

পরিবেশনা
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫

আল আযহার লাইব্রেরী
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৮৮৬-৩০৩৮৩৭

মূল্য : তিনশত নব্বই টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ

চোখ ও যবান মহান আল্লাহর আযীমুশ শান দুটি নেয়ামত। সারা জীবন শুকরিয়া আদায় করলেও শুকরিয়া আদায় হবে না।

শত সহস্র ফায়েদা আমরা এ দুটো অঙ্গের দ্বারা প্রতিনিয়ত লাভ করছি।

اَللّٰهُمَّ لَا نُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ يَا رَبِّ

এ মহান নেয়ামত হতে যারা বঞ্চিত, তারাই বুঝেন এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। একজন অন্ধ মানুষ যিনি দৃষ্টিশক্তি হতে বঞ্চিত অথবা বোবা মানুষ যিনি কথা বলতে পারেন না তিনি বুঝেন তার মনে কত কষ্ট। বুকে কী জ্বালা! কারণ ফার্সী ভাষায় একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে:

قدر نعمت بعد زوال است

অর্থাৎ নেয়ামতের কদর বা মূল্যায়ন হয় তখন, যখন নেয়ামত থাকে না।

তো এই চোখ মহান আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন তাঁর কুদরত দেখার জন্য। যবান বা জিহ্বা দিয়েছেন ভালো ভালো কথা বলার জন্য। কুরআনে কারীম তিলাওয়াত ও যিক্র আযকারের জন্য।

কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! আজ আমরা এত বড় দুটি নেয়ামতের অপব্যবহার করে দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে চলেছি।

কুদৃষ্টি আজ ব্যাপক হয়ে গেছে। ঘরে, বাইরে, দোকানে-মার্কেটে অফিসে আদালতে তথা সর্বত্র আজ কুদৃষ্টির মহোৎসব চলছে। অথচ হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

وَزِنَا الْعَيْنِ اَلنَّظْرُ

"আর চোখের ব্যভিচার হল কুদৃষ্টি।"[১]

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৫২৬

এমনকি এটা যে একটা মারাত্মক গুনাহ, সে অনুভূতিটা পর্যন্ত আমাদের অনেকের নেই।

বরং কিছু কিছু জ্ঞানপাপী তো এমনও মন্তব্য করে যে, "আমাদের মনে কোন পাপ নেই"!! সুতরাং বেগানা নারী বা পুরুষকে দেখলে কী অসুবিধা?

আবার কেউ কেউ বলে যে, নারী হল ফুলের মত সুন্দর। তাই নারীর সৌন্দর্যের মাধ্যমে আমরা স্রষ্টার কুদরত বুঝার চেষ্টা করি!! এটাকেই এভাবেও ব্যক্ত করা হয়: "মাখলূক" (সৃষ্টি) যদি এত সুন্দর হয়, তাহলে "খালেক" (স্রষ্টা) না জানি কত সুন্দর!!

মূলত এ সবই হল শয়তানী যুক্তি। কারণ মনের পর্দাই যদি আসল পর্দা হয়, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমূনা ও হযরত উম্মে সালামা যে দুজন উম্মুল মুমিনীন বা উম্মতজননী, যাঁদের আত্মার পবিত্রতার সার্টিফিকেট দিয়েছেন স্বয়ং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ পাক, কেন অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযি. থেকে পর্দা করতে বলেছিলেন?[২]

আর মহান আল্লাহর কুদরত দেখার জন্য কি এই নারী জাতি ছাড়া আর কিছু নেই? এত সুন্দর নীল আকাশ, সবুজ গালিচা বিছানো ভূমি, ঢেউ খেলানো পাহাড় পর্বত, স্বচ্ছ নীল সাগর মহাসাগর, নিষ্পাপ শিশুর নির্মল হাসি, চন্দ্র, সূর্য, তারার সৌন্দর্য, লক্ষ প্রজাতির জীব জন্তু, শস্য-উদ্ভিদ, গাছ গাছালী, পাখ-পাখালী, গহীন সবুজ বন, রং-বেরঙের ফুল ও প্রজাপতি এ সব কি মহান আল্লাহর বিস্ময়কর কুদরত নয়? فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

কিন্তু ঐ যে কথায় বলে: চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী! ফলে এ সবের মধ্যে তারা মহান আল্লাহর কোন কুদরত খুঁজে পায় না! যত কুদরত সব গিয়ে ঠেকেছে ঐ বেহায়া বেপর্দা নারীদের শরীরের ভাঁজে!! নাউযুবিল্লাহ।

---

২. মুসনাদে আহমাদ; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪১১২; সুনানে আবূ দাউদ

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা إِنَّهَا لَضِغْثٌ عَلٰى إِبَّالَةٍ বা বোঝার উপর শাকের আঁটির মত যুক্ত হয়েছে বর্তমান যমানায় বদনেগাহী ও কুদৃষ্টির সব থেকে বড় হাতিয়ার "স্মার্ট ফোন"। যা তছনছ করে দিচ্ছে আমাদের যুব সমাজের চরিত্র, সুনামি ঝড় বইয়ে দিচ্ছে আমাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার উপর। উস্কে দিচ্ছে ইভটিজিং, নারীধর্ষণ, পরকীয়া ও যেনা ব্যভিচারকে। ফলশ্রুতিকে ধেয়ে আসছে একের পর এক খোদায়ী গযব ও মহামারী।

এ পরিস্থিতিতে নিজের ঈমান-আমল, চরিত্র-সতীত্ব টিকিয়ে রাখা আসলেই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

মানুষ গত কয়েক দশক পূর্বে সিনেমা দেখত হলে বা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে। আর এখন তো আমাদের পকেটগুলোই হয়ে গেছে মিনি সিনেমা হল। এমনকি আমরা যারা খাওয়াস তথা আহলে ইলম, উলামা-তালাবা তারাও এ বিপদ ও ক্যান্সার থেকে মুক্ত নই। إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের দ্বিতীয় বিষয় হল যবানের হেফাযত। যেটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই যবানের হেফাযত এত বেশি জরুরী যে, এ ব্যাপারে সামান্য অবহেলা মানুষকে জাহান্নামে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ জন্যই বলা হয় جِرْمُهٗ صَغِيْرٌ وَجُرْمُهٗ كَبِيْرٌ অর্থাৎ জিহ্বা আকৃতিতে ছোট কিন্তু এর অপরাধ অনেক বড়।

বর্তমান আমরা যে সব গুনাহে সব থেকে বেশি লিপ্ত, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল যবানের গুনাহ। যবানের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক গুনাহ আছে। যেমন কথা বেশি বলা।

তাই তো ফার্সী কবি বলেন :

دل ز پر گرفتن بمیرد در بدن
گرچہ گفتارش بود در عدن

অর্থাৎ অধিক কথা বলার দ্বারা শরীরের যে আত্মা আছে সেই আত্মা মরে যায়। যদিও তার কথাগুলো আদনের (ইয়েমেনের বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর) মুক্তাতুল্যই হোক না কেন।

যবানের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি জঘন্যতম অপরাধ হল কাউকে গালী দেয়া। আসলে কোন সভ্য বা ভদ্র মানুষ কখনো গালী দেয় না। একমাত্র অসভ্য ইতর শ্রেণীর লোকেরাই গালিগালাজ করে।

যবানের আরেকটি বিপদ হল মিথ্যা কথা বলা। যা বর্তমানে আমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে:

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ

অর্থাৎ "একজন মুমিন ব্যক্তির অনেক বদ স্বভাব থাকতে পারে কিন্তু আমানতের খেয়ানত ও মিথ্যা কথা কোন মুমিন কখনো বলতে পারে না।"[৩]

আর যবানের সব থেকে বড় মুসীবত ও সমস্যা হল "গীবত"। অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা। বলতে গেলে এটাই বর্তমানে আমাদের মহাসমস্যা। আওয়াম-খাওয়াস তথা সর্বশ্রেণীর মানুষ এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। কেমন যেন এটা "ঘি-ভাত" হয়ে গেছে।

হযরত শাইখুল ইসলাম হাফি. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এবং যবানের আরেকটি বিপদ "চোগলখোরী" সম্পর্কেও নীতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

আসলে যে ভালো হতে চায় তার জন্য একটি আয়াত বা একটি হাদীস অথবা বুযুর্গানে দ্বীনের একটি নসীহতই যথেষ্ট। আর যদি কারো পরিবর্তনের নিয়্যত না থাকে, আত্মশুদ্ধির ফিকির না থাকে, তবে শত সহস্র গ্রন্থও তার জন্য অনর্থক।

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

যাকে আল্লাহ হেদয়াতে দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারে না।

---

৩. বাইহাকী শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৪৬৯

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি ও নাযুক মুহূর্তে এ যুগের হাকীমুল উম্মাত থানভী, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব হাফি. এর চোখ ও যবানের হেফাযত বিষয়ক দুটি বয়ান আমার কাছে অত্যন্ত সময়োপযোগী মনে হয়েছে।

এর পাশাপাশি আরো দুটি ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধি তথা হিংসা ও গোস্বা বিষয়ক হযরতওয়ালার দুটি অসাধারণ ও মূল্যবান বয়ানও হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুমের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলাহী খুতুবাত সিরিজ থেকে মূলত আমার ইসলাহ ও সংশোধনের নিয়্যতে أُوْصِيْ نَفْسِيْ أَوَّلًا بِالتَّقْوٰى তরজমা করে দিয়েছি। কারণ বর্তমানে সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতার জন্য এ দুটো সামাজিক ব্যাধিও বহুলাংশে দায়ী। এই সামাজিক দুষ্টক্ষত "হিংসা" ও ভয়ংকর রোগ "গোস্বার" আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে হাজারো মানুষ, শত সহস্র সোনার সংসার, অসংখ্য মহিলা হচ্ছেন স্বামীহারা বিধবা বা সন্তানহারা মা, ছেলেমেয়ে হচ্ছে ইয়াতীম।

আশা করি এ বয়ানগুলো গভীর মনোযোগ সহ পাঠ করার দ্বারা আমাদের চিন্তা-চেতনায়, মন-মানসিকতায়, আমল-আখলাকে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। সমাজে প্রবাহিত হবে শান্তি সুখের ফল্গুধারা।

إِنْ أُرِيْدُ إِلاَّ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ.

তারিখ
২৫/০৬/১৪৪৪ হি:
১৯/০১/২০২৩ ইং
ভোর ৫:৪৫ মি:

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

চোখের হেফাযত করুন [১ম অধ্যায়]

একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি
কুদৃষ্টির হাকীকত বা বাস্তবতা
এই তিক্ত ঢোক পান করতে হবে
আরবদের কাহ্ওয়া
অতঃপর মিষ্টতা ও স্বাদ হাসিল হবে
চোখ অনেক বড় নেয়ামত
এক মুহূর্তে সাত মাইল সফর
চোখের সঠিক ব্যবহার
কুদৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার চিকিৎসা
কুপ্রবৃত্তিগত খারাপ কল্পনাসমূহের চিকিৎসা
যদি তোমাদের জীবনের ফিল্ম চালিয়ে দেয়া হয়?
অন্তরের আকর্ষণ গুনাহ নয়
খারাপ কল্পনা করে স্বাদ গ্রহণ করাও হারাম
রাস্তায় চলার সময় নজর নিচু রাখুন
এই কষ্ট জাহান্নামের কষ্টের চেয়ে কম
হিম্মতের সাথে কাজ নিন
দুটি কাজ করুন
হযরত ইউসুফ আ. এর আদর্শ অবলম্বন করুন
হযরত ইউনুস আ. এর পদ্ধতি অবলম্বন করুন
আমাকে ডাকো
দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দু'আর কবূলিয়্যত
দ্বীনী উদ্দেশ্যে দু'আ অবশ্যই কবূল হয়
দু'আর পরে যদি গুনাহ হয়ে যায়?
তাওবার তাওফীক অবশ্যই হয়ে যায়
এরপর আমি তোমাকে উঁচু মাকামে পৌঁছাব
সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার একমাত্র ব্যবস্থাপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

চোখের হেফাযত করুন [২য় অধ্যায়]

ভূমিকা
এটা পশ্চিমা সভ্যতা
এই স্পৃহা কোন সীমানায় থামবে না
এরপরও পরিতৃপ্ত হয় না
সীমালংঘনের পরিণতি
প্রথম পাবন্দী, নজরের হেফাযত
দৃষ্টি নিচু রাখুন
বর্তমানে নজর বাঁচানো মুশকিল
এই চোখ কত বড় নেয়ামত
চোখের হেফাযতের জন্য পয়সা খরচ করতে প্রস্তুত
চোখের মণির অদ্ভূত অবস্থা
চোখ হেফাযতের খোদায়ী ব্যবস্থাপনা
চোখের উপর শুধুমাত্র দুটি পাবন্দী
যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার সময় শর্ত লাগিয়ে দেয়া হয়?
দৃষ্টিপাত সাওয়াবের উপলক্ষও বটে
নজর হেফাযতের একটি পদ্ধতি
হিম্মতের সাথে কাজ নিন
সারকথা

চোখ অনেক বড় নেয়ামত [৩য় অধ্যায়]

ভূমিকা
প্রথম নির্দেশ : নজরের হেফাযত
চোখ অনেক বড় নেয়ামত
চোখও ব্যভিচার করে
লজ্জাস্থানের হেফাযত চোখের হেফাযতের উপর নির্ভরশীল
দুর্গ অবরোধ
মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি হতে বাঁচুন

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পুরো সৈন্যবাহিনী বাজার পার হয়ে গেল
এ দৃশ্য দেখে ইসলাম গ্রহণ করল
ইসলাম কি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে?
শয়তানের হামলা হয় চতুর্মুখী
নিচের পথ সংরক্ষিত
আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিতির ধ্যান
আচমকা দৃষ্টি মাফ
এটা নিমকহারামী
আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ

যবানের হেফাযত করুন (১ম অধ্যায়) #

তিনটি পবিত্র হাদীস
যবানের হেফাযত করুন
যবান এক বিশাল নেয়ামত
যদি যবান বন্ধ হয়ে যায়
যবান আল্লাহর আমানত
যবানের সঠিক ব্যবহার
যবানকে যিক্‌র দ্বারা তরুতাজা রাখুন
যবানের মাধ্যমে দ্বীন শেখান
সমবেদনামূলক কথা বলা
যবান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে
প্রথমে ওজন করো অতঃপর বলো
হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ.
আমাদের উদাহরণ
যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চিকিৎসা
যবানে তালা দিয়ে দিন
গপশপে যবান ব্যবহার করা
নারীজাতি ও যবানের ব্যবহার

বিষয় পৃষ্ঠা

আমি জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি
নাজাতের জন্য তিনটি কাজ
হে যবান! আল্লাহকে ভয় কর
কেয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কথা বলবে

যবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করুন (২য় অধ্যায়)

দায়িত্বশীল মানুষের ভূমিকা পালন করুন
যবান অনেক বড় নেয়ামত
যবানের মূল্য কত যবানহীন মানুষকে জিজ্ঞেস করুন
সমস্ত মেশিন নড়াচড়া করছে
চিন্তা-ভাবনা করে যবানকে ব্যবহার করুন
প্রতিটি কথা রেকর্ড হচ্ছে
তখন কেন সতর্ক হয়ে কথা বল?
দায়িত্বশীল হওয়ার চিন্তা করুন
মিথ্যার নিকৃষ্টতম আরোহী
পরস্পরে লড়াই ঝগড়া কেন জন্ম নিচ্ছে?
সমস্ত ঝগড়া খতম হয়ে যাবে
গীবত: যবানের একটি ভয়াবহ গুনাহ
(৩য় অধ্যায়)
“গীবত” একটি ভয়াবহ গুনাহ
“গীবত” এর সংজ্ঞা
“গীবত” কবীরা গুনাহ
এরা নিজেদের চেহারা নখ দ্বারা আচড়াবে
গীবত ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য গুনাহ
গীবতকারীকে জান্নাতে প্রবেশ থেকে আটকে দেয়া হবে
নিকৃষ্টতম সুদ হল গীবত
গীবত, মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া
গীবত ও ভয়ংকর একটি স্বপ্ন

বিষয় **পৃষ্ঠা**

হারাম খাওয়ার অন্ধকার
গীবতের অনুমতির ক্ষেত্রসমূহ
অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য গীবত করা
যদি অন্যের প্রাণহানির আশংকা হয়
প্রকাশ্য গুনাহকারীর গীবত
এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত
ফাসেক ও ফাজেরের গীবত জায়িয নেই
জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়
গীবত থেকে বাঁচার জন্য সাহস ও হিম্মত
গীবত হতে বাঁচার কৌশল
গীবতের কাফফারা
কারো হক নষ্ট করে থাকলে ক্ষতিপূরণের উপায় কি?
মাফ করা ও করানোর ফযীলত
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষমা প্রার্থনা
ইসলামের একটি নীতি
গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ
নিজ বদঅভ্যাসগুলোর দিকে নজর দিন
আলোচনার ধারা বদলে দিন
“গীবত” সমস্ত অনিষ্টের মূল
ইশারায় গীবত করা
গীবত হতে বাঁচার চেষ্টা করুন
গীবত হতে বাঁচার পদ্ধতি
গীবত থেকে বাঁচার পাক্কা নিয়্যত করুন
চোগলখোরী: একটি ভয়াবহ গুনাহ
“চোগলখোরী” গীবতের চেয়েও ভয়াবহ গুনাহ
কবর আযাবের দুটি কারণ
পেশাবের ছিঁটা হতে বেঁচে থাকুন

বিষয় **পৃষ্ঠা**

চোগলখোরী থেকে বাঁচুন
গোপন রহস্য ফাঁস করাও চোগলখোরী
যবানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুনাহ
حسد: ایک معاشرتی ناسور
হিংসা: একটি সামাজিক দুষ্টক্ষত
হিংসা একটি আত্মিক ব্যাধি
হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে
হিংসা থেকে বাঁচা ফরযে আইন
হিংসার সংজ্ঞা
“ঈর্ষা” করা জায়িয
হিংসার তিনটি স্তর
সর্বপ্রথম হিংসাকারী
হিংসার অনিবার্য পরিণতি
হিংসার কারণ দুটি
হিংসার দরুন দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি ধ্বংস হয়ে যায়
হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে
হিংসার প্রথম চিকিৎসা
তিন জগত
প্রকৃত শান্তি পেয়েছে কে?
‘রিযক’ একটি নেয়ামত আর ‘খাওয়ানো’ আরেকটি নেয়ামত
মহান আল্লাহর হেকমতের ফয়সালা
উর্দূ ভাষার একটি প্রবাদ
স্বীয় নেয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন
সব সময় নিজের থেকে নিচের মানুষের দিকে দেখবে
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এবং শান্তি
মানুষের চাহিদা কখনোই শেষ হয় না
এটা আল্লাহ তাআলার বণ্টন

বিষয় **পৃষ্ঠা**

হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা
এক বুযুর্গের ঘটনা
ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর গীবত হতে সতর্কতা
ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর আরেকটি ঘটনা
প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি কে?
জান্নাতের সুসংবাদ
তার উপকার, আমার ক্ষতি
হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা
হিংসা দু'প্রকার
সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার করবে
তার ব্যাপারে দু'আ করবে
হক নষ্ট করার ব্যাখ্যা
অধিক ঈর্ষা করাও ভাল নয়
দ্বীনের কারণে ঈর্ষা করা ভালো
দুনিয়ার জন্য ঈর্ষা পছন্দনীয় নয়
শাইখ এবং মুরব্বীর প্রয়োজনীয়তা
غصے کو قابو میں کیجئے
গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন
নাহের দু'টি উপলক্ষ: গোস্বা ও কু-প্রবৃত্তি
আত্মশুদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ
"গোস্বা" একটি প্রকৃতিগত জিনিস
গোস্বার ফলে সৃষ্ট গুনাহসমূহ
"বিদ্বেষ" গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়
"হিংসা" গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়
গোস্বার ফলে বান্দার হকসমূহ নষ্ট হয়
গোস্বা না করার উপর বিশাল প্রতিদান
শাহ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. এর ছেলের মুজাহাদা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অহংকারের চিকিৎসা
দ্বিতীয় পরীক্ষা
তৃতীয় পরীক্ষা
চতুর্থ পরীক্ষা
বড় পরীক্ষা এবং দৌলতে বাতেনী লাভ
গোস্বা নিয়ন্ত্রণে রাখুন, ফেরেশতাদের থেকে আগে বেড়ে যান
ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর একটি ঘটনা
চল্লিশ বছর যাবত ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায
ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেত
নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ ধৈর্যশীল
"হিলম" বা ধৈর্য সৌন্দর্য দান করে
গোস্বা হতে বাঁচার কৌশলসমূহ
গোস্বার সময় أَعُوْذُ بِاللهِ পড়ুন
গোস্বার সময় বসে যাও বা শুয়ে পড়
গোস্বার সময় মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করবে
আল্লাহ তাআলার ধৈর্য
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর ক্রীতদাসকে বকা দেয়া
শুরুতেই গোস্বাকে একদম দমিয়ে রাখতে হবে
গোস্বায় ভারসাম্য
আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নানা মেযাজী রং
গোস্বার সময় ধমক দেয়া নিষেধ
হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর ঘটনা
বকাঝকার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে
গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র
পরিপূর্ণ ঈমানের চারটি আলামত
প্রথম আলামত

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দ্বিতীয় আলামত
তৃতীয় ও চতুর্থ আলামত
ব্যক্তিকে ঘৃণা করব না
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপদ্ধতি
হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর একটি ঘটনা
গোস্বা যেন আল্লাহর জন্য হয়
হযরত আলী রাযি. এর ঘটনা
হযরত ফারূকে আযম রাযি. এর ঘটনা
কৃত্রিম গোস্বা করে বকা দিবেন
ছোটদের উপর বাড়াবাড়ির ফলাফল
সারকথা
গোস্বার ভুল ব্যবহার
আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর একটি কথা
তোমরা খোদায়ী ফৌজদার নও

آنکھوں کی حفاظت کیجئے

চোখের হেফাযত করুন

[১ম অধ্যায়]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাদ হামদ ও সালাত।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠

অর্থাৎ "হে নবী! আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এটা তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই পুরোপুরি অবগত।"[৪]

একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি

এ আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ আমাদের একটি আত্মিক ব্যাধির আলোচনা করেছেন। আর সেটা হল "বদনেগাহী" বা কুদৃষ্টি। এই কুদৃষ্টি এমনই একটা ব্যাধি যার মধ্যে বহু মানুষ লিপ্ত। ভালো ভালো শিক্ষিত মানুষ, আলেম উলামা, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট আসা-যাওয়াকারী, ধর্মপ্রাণ মুসলমান, নামায রোযার পাবন্দ মানুষও এ ব্যাধিতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। আর বর্তমানে তো অবস্থা হল এই যে, বাসা থেকে বের হলেই নজরের হেফাযত করা মুশকিল হয়ে যায়। চতুর্দিকে এমন সব দৃশ্য দেখা যায় যেগুলো থেকে দৃষ্টি হটানো খুবই কঠিন।

৪. সূরা নূর, আয়াত ৩০

কুদৃষ্টির হাকীকত বা বাস্তবতা

কুদৃষ্টির সারকথা হল কোন গাইরে মাহরাম বা বেগানা নারী পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। বিশেষত যদি কামবাসনা নিয়ে দৃষ্টিপাত করা হয়, অথবা স্বাদ গ্রহণের জন্য দৃষ্টিপাত করা হয়, চাই সে গাইরে মাহরাম জীবন্ত কোন মানব বা মানবী হোক, অথবা চাই গাইরে মাহরাম কারো ছবি হোক, সেদিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম এবং "বদনেগাহীর" অন্তর্ভুক্ত।

কুদৃষ্টির এ বদঅভ্যাস নিজ নফসের ইসলাহের পথে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক। আর এই কাজটা মানুষের আত্মার জন্য এমন ধ্বংসাত্মক যে, অন্যান্য গুনাহ হতে এর ধ্বংসলীলা অনেক বেশি। মানুষের ভিতরকে নষ্ট করার জন্য এর যথেষ্ট ভূমিকা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আমলের ইসলাহ বা সংশোধন না হবে, এবং দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব।

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مَسَمُوْمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ অর্থাৎ এই "নজর" ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর।[৫]

(এই তীর যেটা) ইবলীসের ধনুক হতে বের হচ্ছে। যদি কেউ এটাকে শীতল পেটে সহ্য করে নেয় আর এর সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে, তো এর মর্ম হল তার আত্মশুদ্ধির পথে এখন অনেক বড় প্রতিবন্ধক দাঁড়িয়ে গেছে। কেননা মানুষের ভিতরকে নষ্ট করার জন্য চোখের অপব্যবহারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। অন্য কোন কাজের সম্ভবত এত বড় ভূমিকা নেই।

এই তিক্ত ঢোক পান করতে হবে

আমি আমার শাইখ হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ. এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "নজরের ভুল ব্যবহার দিলের জন্য হত্যাকারী বিষ। আত্মার পরিশুদ্ধি যে চায় তাকে সর্বপ্রথম ঐ নজরের হেফাযত করতে হবে।"

---

৫. তাবারানী, হাদীস নং ১০৩৬২

কাজটি অনেক কঠিন মনে হয়। খোঁজ করেও চোখের আশ্রয় পাওয়া যায় না। চতুর্দিকে পর্দাহীনতার সয়লাব, উলঙ্গপনা আর বেহায়াপনার বাজার গরম। এমন পরিস্থিতিতে নিজের নজর হেফাযত খুব কঠিন মনে হয়। কিন্তু যদি কেউ ঈমানের মিষ্টতা পেতে চায়, মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক চায়, এবং নিজ আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি চায়, তবে তাকে নজর হেফাযতের এ তিক্ত ঢোক তো পান করতেই হবে। এটা ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই তিক্ত ঢোকটি এমন যে, শুরুতে তো খুব তিতা হয় কিন্তু অভ্যাস বানিয়ে নিতে পারলে এটাই মিষ্টি হয়ে যায়। এমনকি এটা ছাড়া মনে তৃপ্তিই আসে না।

আরবদের কাহওয়া

আরবদেশের মানুষ "কাহওয়া" পান করে থাকে। আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেছেন তারা ছোট ছোট পেয়ালায় কাহওয়া পান করেন। আমার মনে আছে যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন কাতারের একজন শাইখ করাচী এসেছিলেন। মুহতারাম আব্বাজানের রহ. সাথে আমিও তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ঐ সাক্ষাতের সময় সেই মজলিসে জীবনে প্রথমবারের মত কাহওয়া দেখলাম। সেই কাহওয়া সবাইকে পান করার জন্য পরিবেশন করা হল। কাহওয়া শব্দটা শোনামাত্রই মনের মধ্যে এমন খেয়াল আসল যে, জিনিসটা মিষ্টি হবে। কিন্তু যখন সেটাকে মুখের সাথে লাগালাম তখন বুঝতে পারলাম যে, এটা এত বেশি তিক্ত একটা জিনিস যে, এটাকে হলক দিয়ে নামানোই কঠিন ব্যাপার। অথচ সেটা সামান্য একটি কাহওয়া ছিল। আর সেটার স্বাদও তিক্ত ছিল। এখন ঐ মজলিসে বসে তো কুলিও করতে পারছিনা। এজন্য বাধ্য হয়ে কোন রকমে সেটাকে হলক থেকে নিচে নামিয়েছি। কিন্তু যখন হলক থেকে নিচে নামালাম তখন সেটার সামান্য স্বাদ অনুভব করলাম। পরবর্তীতে আরেকটি মজলিসে পান করার সুযোগ হল। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, এটা পান করতে মজা ও

স্বাদ লাগা আরম্ভ হল। এত স্বাদ যার কোন শেষ নেই। এজন্য এখন এটা পানের অভ্যাস হয়ে গেছে।

অতঃপর মিষ্টতা ও স্বাদ হাসিল হবে

অনুরূপভাবে নজরের হেফাযত, এটাও একটি তিক্ত ঢোক। শুরু শুরুতে এটা পান করা খুব কঠিন মনে হয়। কিন্তু পান করার পর যখন স্বাদ হাসিল হওয়া আরম্ভ হবে, তখন দেখবেন এটা পান করতে কেমন মজা লাগে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর মিষ্টতা ও স্বাদ দান করুন। আমীন।

যাই হোক, এটা এমন একটা জিনিস যে, যদি একবার আমরা এর তিক্ততা বরদাশত করতে পারি, আর একবার দিলের উপর পাথর রেখে এর তিক্ততাকে গিলে ফেলতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ এমন স্বাদ, এমন মিষ্টতা ও মানসিক প্রশান্তির নেয়ামত দান করবেন যার তুলনায় কুদৃষ্টির স্বাদ একেবারেই তুচ্ছ। কোন হাকীকতই নেই।

চোখ অনেক বড় নেয়ামত

এই চোখ হল একটা মেশিন। আর এটা আল্লাহ তাআলার এমন নেয়ামত যে, মানুষ এটার কল্পনাও করতে পারবে না। চাওয়া ছাড়াই এটা পাওয়া গেছে। বিনামূল্যে নসীব হয়েছে। এর জন্য কোন মেহনত বা পয়সা খরচ করতে হয়নি। এজন্য এ নেয়ামতের কদর নেই। ঐসব মানুষের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করুন যারা এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। অন্ধ, অথবা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। অথবা যাদের নিকট এ নেয়ামত শুরু থেকেই নেই। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন এই চোখ কী জিনিস? আর আল্লাহ না করুন যদি দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা দেখা দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি বিদায় নিচ্ছে বলে মনে হয়, তখন বুঝে আসবে যে, সমস্ত জগত অন্ধকার হয়ে গেছে। আর তখন মানুষ তার সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও কামনা করে যেন এ নেয়ামত তার পুনরায় হাসিল

হয়ে যায়। চোখ এমনই এক কুদরতী মেশিন আজ পর্যন্ত কেউ যেটা আবিষ্কার করতে পারেনি।

এক মুহূর্তে সাত মাইল সফর

আমি একটি কিতাবে পড়েছিলাম যে, মহান আল্লাহ মানুষের চোখে যে মণি রেখেছেন, এটা অন্ধকারে সম্প্রসারিত হয় আর আলোতে সংকুচিত হয়ে পড়ে। যখন মানুষ অন্ধকার থেকে আলোতে আসে অথবা আলো থেকে অন্ধকারে যায়, তখন এই সম্প্রসারণ ও সংকোচনের কাজ চলতে থাকে। আর এই সম্প্রসারণ ও সংকোচনের ক্ষেত্রে মানুষের চোখের শিরা উপশিরা সাত মাইলের পথ অতিক্রম করে। কিন্তু মানুষের খবরও থাকে না যে ব্যাপারটা কী হল? এমন নেয়ামত মহান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন।

চোখের সঠিক ব্যবহার

এখন যদি এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার হয়, তবে আল্লাহ তাআলা এর উপর নেকী দান করেন। উদাহরণস্বরূপ এ চোখের দ্বারা মহব্বতের দৃষ্টিতে নিজ পিতা-মাতাকে দেখা। তাহলে হাদীসে পাকের ভাষ্য অনুযায়ী একটি মাকবূল হজ্ব ও একটি মাকবূল উমরার সাওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহু আকবার।[৬]

আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, স্বামী যদি স্ত্রীর দিকে আর স্ত্রী স্বামীর দিকে মহব্বতের নজরে তাকায়, তাহলে আল্লাহ তাআলাও উভয়ের দিকে রহমতের নজরে তাকান।

চোখের ব্যবহার সঠিক হলে মহান আল্লাহ ঈমানী স্বাদ ও মিষ্টতা দান করেন। আবার এর উপর সওয়াব ও নেকীও দান করেন। কিন্তু চোখের অপব্যবহার হলে বা ভুল স্থানে দৃষ্টিপাত হলে সেটার শাস্তিও কিন্তু বড় মারাত্মক। এবং এটা মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে ফেলে।

---

৬. শুআবুল ঈমান বাইহাকী, ১০:২৬৫

কুদৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার চিকিৎসা

এখন এই কুদৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার একটাই পথ। আর সেটা হল হিম্মত করা। পাক্কা নিয়্যত করা যে, নজরের অপব্যবহার করব না। এরপর অন্তরের উপর চাই করাতই চলুক না কেন, তবুও কুদৃষ্টি করা যাবে না।

آرزوئیں خون ہوں، یا حسرتیں برباد ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

আকাংখাগুলো খুন হয়ে যাক, হোক না আশা ভঙ্গ,
এখন তো এ দিলকে বানাতে হবে স্রেফ আপনারই জন্য।

ব্যস হিম্মত ও ইচ্ছা করে এই দৃষ্টিটাকে হেফাযত করুন। তাহলে দেখবেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কেমন নুসরাত ও সাহায্য আসে।

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এই কুদৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার কিছু তদবীর বা কৌশল বাতলিয়েছেন। সেগুলো স্মরণ রাখার মত।

হযরত রহ. বলেন: যদি কোন বেগানা মহিলা সামনে পড়ে আর নফস একথা বলে যে, একবার দেখলে কী এমন ক্ষতি? কারণ তুমি তার সাথে কোন অপকর্ম তো আর করবে না...। তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা নফসের ধোঁকা। নাজাতের পথ ও পন্থা এটাই যে এই কুপ্রস্তাবের উপর আমল করা যাবে না।[৭]

এজন্য এটা শয়তানের ধোঁকা। সে বলে দেখতে কী সমস্যা? দেখা তো এজন্যই নিষেধ যাতে মানুষ কোন অপকর্মে জড়িয়ে না পড়ে আর এখানে তো অপকর্মের আশংকাই নেই। এজন্য (সুন্দরী নারী বা সুশ্রী বালককে) দেখে নাও। এতে কোন অসুবিধা নাই!!

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত রহ. বলেন: এটা নফসের একটা ধোঁকা। আর এর চিকিৎসা হল এর কথা মত আমল করা হবে না। চাই অন্তরে দেখার চরম চাহিদাই হোক না কেন। দৃষ্টিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিবে।

---

৭. আনফাসে ঈসা, পৃঃ ১৪২, খণ্ড ১

কুপ্রবৃত্তিগত খারাপ কল্পনাসমূহের চিকিৎসা

আমার শাইখ হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. একবার বলছিলেনঃ এই যে গুনাহের তাকাযা বা চাহিদা সৃষ্টি হয়, সেটার চিকিৎসা এভাবে করবে যে যখন অন্তরে প্রচন্ড খারাপ চাহিদা সৃষ্টি হয় যে, এই দৃষ্টিকে ভুল স্থানে ব্যবহার করব এবং ভুল স্থানে ব্যবহার করে স্বাদ হাসিল করব, তখন অল্প সময়ের জন্য এটা চিন্তা কর যে, যদি আমার আব্বা আমাকে এ অবস্থায় দেখে ফেলেন, তখনো কি আমি এ বদনেগাহী অব্যাহত রাখব? অথবা যদি জানতে পারি যে, আমার শাইখ আমাকে এ অবস্থায় দেখছেন, তখনো কি আমি এ অপকর্ম অব্যাহত রাখব? অথবা যদি জানতে পারি যে, আমার সন্তানগণ আমাকে এ অবস্থায় দেখছে, তারপরও কি আমি এ অপতৎপরতা চালিয়ে যাব?

জানা কথাই যে, এদের মধ্যে কেউ যদি আমার এ কাজকে দেখতে থাকে তবে আমি আমার নজরকে নিচু করে ফেলব এবং এই কাজ করব না। অন্তরে যত মারাত্মক খারাপ চাহিদাই সৃষ্টি হোক না কেন।

অতঃপর এটা চিন্তা করুন যে, এসব মানুষের দেখা বা না দেখার দ্বারা আমার দুনিয়া ও আখেরাতে কোন পার্থক্য হবে না। কিন্তু আমার এ অবস্থা তো আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ দেখছেন। আমি সেটার পরোয়া করছি না কেন? কেননা তিনি আমাকে এ অন্যায়ের উপর শাস্তিও দিতে পারেন। এই চিন্তা ও খেয়ালের বরকতে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ আমাকে এ গুনাহ হতে হেফাযত করবেন।

যদি তোমাদের জীবনের ফিল্ম চালিয়ে দেয়া হয়?

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. এর আরেকটি কথা মনে এসে গেল। তিনি বলতেন: সামান্য একটু চিন্তা কর যে, যদি আল্লাহ তাআলা আখেরাতে তোমাদেরকে এভাবে বলেন যে, আচ্ছা যদি তোমাদের জাহান্নামের ব্যাপারে ভয় লাগে, তাহলে আমি তোমাদেরকে আগুন ও জাহান্নাম হতে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেটার জন্য একটি শর্ত আছে। সেটা হল আমি তোমাদের শৈশব থেকে যৌবন ও বার্ধক্য বরং মৃত্যু পর্যন্ত যে

যিন্দেগী তোমরা যাপন করেছ সেটার ফিল্ম চালিয়ে দিব। সেই ফিল্মের দর্শকদের মধ্যে তোমাদের আব্বা-আম্মা, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততিও হবে। এমনকি তোমাদের শিক্ষক-ছাত্র, বন্ধু-বান্ধবও থাকবেন। আর ঐ ফিল্মের মধ্যে তোমাদের পুরো জীবনের নকশা তুলে ধরা হবে। এটা তোমরা মেনে নিলে তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে বাঁচানো হবে।

এরপর হযরতওয়ালা রহ. বলতেন: এ জাতীয় ক্ষেত্রে মানুষ সম্ভবত আগুনের আযাব কেও মেনে নিবে কিন্তু এটা বরদাশত করতে পারবে না যে, ঐ সমস্ত মানুষের সামনে আমার জীবনচিত্র উপস্থাপিত হোক।

তো যখন মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য মানুষের সামনে নিজের জীবনের নকশা চলে আসা মানতে পারি না, তাহলে এসব অবস্থা মহান আল্লাহর সামনে আসাটাকে কিভাবে মেনে নিতে পারো? এটা একটু চিন্তা কর।

অন্তরের আকর্ষণ গুনাহ নয়

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. অন্য একটি মালফূযে বলেন: "কুদৃষ্টির মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ পাওয়া যায় যেটা গাইরে ইখতিয়ারী বা ইচ্ছাবহির্ভূত বিষয়। আর এটার উপর ধর পাকড়ও হবে না। আর আরেকটা স্তর হল সেই কুদৃষ্টির চাহিদার উপর আমল করা, এটা তো মানুষের ইখতিয়ারী বিষয়। তাই এর উপর পাকড়াও হবে।[৮]

আকর্ষণের মর্ম হল: দেখতে খুব মনে চাচ্ছে, দিল তড়পাচ্ছে। দিলের এ তড়পানো, মনের এ আকর্ষণ যেহেতু গাইরে ইখতিয়ারী ব্যাপার। এজন্য এটার উপর মহান আল্লাহর কাছে কোন পাকড়াও হবে না। গ্রেফতারী হবে না, গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আরেকটি স্তর হল, দিলের এ চাহিদার উপর আমল করল। বদনেগাহী বা কুদৃষ্টি করল, এটা যেহেতু ইখতিয়ারী, তাই এর উপর পাকড়াও হবে। অথবা কারো উপর গাইরে ইখতিয়ারী তথা অনিচ্ছাকৃত

---

৮. আনফাসে ঈসা

ভাবে নজর পড়ে গেল কিন্তু নিজের ইখতিয়ারে সেই নজরটাকে ধরে রাখল। এটার উপরও ধর-পাকড় হবে। এবং এটার কারণেও গুনাহ হবে। তো আকর্ষণের প্রথম স্তর যেটা ইচ্ছা বহির্ভূত, সেটা মাফ। সেটার উপর পাকড়াও হবে না। আর দ্বিতীয় স্তর হল ইখতিয়ারী তথা ইচ্ছাধীন। বিধায় এটার উপর পাকড়াও করা হবে।

খারাপ কল্পনা করে স্বাদ গ্রহণ করাও হারাম

"আর এ কাজের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা ও কল্পনা করা সবই অন্তর্ভুক্ত। এর চিকিৎসা হল নফসকে নিবৃত্ত রাখা এবং দৃষ্টিকে অবনত রাখা।"

কোন বেগানা ও গাইরে মাহরাম মহিলার কথা কল্পনা করে মজা নেয়া এটাও ঐ রকম হারাম যেরকম হারাম সরাসরি কুদৃষ্টি করা। তো দেখা, চিন্তা করা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আর এর চিকিৎসা হযরত এটা বাতলে দিয়েছেন যে, নফসকে বিরত রাখতে হবে এবং দৃষ্টিকে অবনত রাখতে হবে। সামনে পিছনে, ডানে-বামে, এদিক-সেদিক তাকানোর পরিবর্তে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে।

রাস্তায় চলার সময় নজর নিচু রাখুন

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত রহ. বলেন: যখন আল্লাহ তাআলা শয়তানকে জান্নাত হতে বের করে দেন তখন যাওয়ার সময় সে দু'আ চেয়ে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করুন। আল্লাহ তাআলাও তাকে অবকাশ দান করেন।

তাইতো সে বলেছিল-

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَيۡنِ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ اَيۡمَانِهِمۡ وَعَنۡ شَمَآئِلِهِمۡ ؕ

অর্থাৎ "আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদের সামনে দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে, এবং বাম দিক দিয়ে আসব।"[৯]

---

৯. সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭

অর্থাৎ বনী আদমের উপর আমি চতুর্মুখী আক্রমণ করব।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. বলেন: শয়তান চারটা দিকের কথা তো বলেছে। বুঝা গেল শয়তানের হামলা এই চারদিক দিয়েই হয়। কখনো সামনে, কখনো পিছনে, কখনো ডানে আবার কখনো বামে। কিন্তু দুইটা দিকের কথা সে বলেনি। ছেড়ে দিয়েছে। এক হল উপরের দিক। আরেকটা হল নিচের দিক। এজন্য উপরের দিকও সংরক্ষিত, আর নিচের দিকও সংরক্ষিত। কিন্তু মুশকিল হল উপরের দিকে তাকিয়ে হাঁটলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার আশংকা। এজন্য এখন একটি পথই খোলা থাকল আর সেটা হল নিচের দিকে তাকিয়ে চলা। তাহলেই ইনশাআল্লাহ শয়তানের চতুর্মুখী হামলা হতে আমরা নিরাপদ থাকতে পারব।

এজন্য অকারণে ডানে-বামে তাকানো যাবে না। ব্যস আল্লাহ আল্লাহ যিক্‌র করতে করতে নিচের দিকে নজর রেখে চলতে হবে। তবেই আল্লাহ পাকের হেফাযত আমাদের সাথে শামিল হবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ

অর্থাৎ "ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টি নত রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে।"[১০]

তো স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে নজর নিচু রাখতে বলেছেন। আর সামনে এর ফলাফল বয়ান করেছেন যে, এর দ্বারা লজ্জাস্থানের হেফাযত হবে এবং চরিত্র বা সতীত্ব ঠিক থাকবে।

এই কষ্ট জাহান্নামের কষ্টের চেয়ে কম

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. সামনে আরো বলেন: "হিম্মত করে এটাকে অবলম্বন করুন। যদিও নফসের কষ্ট হবে। কিন্তু এই কষ্ট জাহান্নামের আগুনের কষ্টের চেয়ে কম।"

---

১০. সূরা নূর, আয়াত ৩০

অর্থাৎ এখন তো নজর বা দৃষ্টি হেফাযত করতে গিয়ে নফসের খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এই কুদৃষ্টির ফলে জাহান্নামের যে শাস্তি ভোগ করতে হবে, সেই কষ্টের তুলনায় এ কষ্ট হাজার লক্ষ বরং কোটি গুণ কম। বরং এ দুনিয়ার কষ্টের সেই আখেরাতের কষ্টের সাথে কোন তুলনা হয় না। কেননা সেখানের আযাব হল সীমাহীন। যেটা কখনো খতম হবে না। অথচ এখানের কষ্ট শেষ হয়ে যাবে।

হিম্মতের সাথে কাজ নিন

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. সামনে আরো বলেন: "যখন কয়েক দিন হিম্মত করে এমন করা হবে, তখন আকর্ষণও কমে আসবে। ব্যস এটাই চিকিৎসা। এটা ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই। যদিও সারাজীবন পেরেশান থাকুক।"

কেননা যখন মানুষ মেহনত ও পরিশ্রম করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য হেদায়েতের দরওয়াযাসমূহ উন্মুক্ত করে দেন।

কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ

"আর যারা আমাকে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় আমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে পাওয়ার একাধিক পথ তাদেরকে দেখিয়ে দিব।"[১১]

সুতরাং যারা মুজাহাদা করবে, প্রচেষ্টা চালাবে, দৃষ্টিকে নত রাখবে, মহান আল্লাহ নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের দিকে তার আকর্ষণও কমিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

ব্যস এটাই চিকিৎসা। এটা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নেই। যদিও সারাজীবন পেরেশান থাকুক না কেন। কিন্তু সাধারণত মানুষ চায় যখন আমরা শাইখ বা পীর ছাহেবের কাছে যাব, তখন যেন তিনি আমাকে এমন একটি ফূঁক মারেন বা ব্যবস্থাপত্র বাতলে দেন অথবা কোন এমন ওয়াযীফা বলে দেন যেটার দ্বারা বেগানা নারী বা সুশ্রী বালকদের দিকে আকর্ষণই খতম হয়ে যাবে।

---

১১. সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৯

আরে ভাই! এমনটি হয়না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ হিম্মতের সাথে কাজ না করবে, কিছুই হবে না।

দুটি কাজ করুন

দেখুন, দুটি কাজ করুন। একটি হল হিম্মতকে ব্যবহার করুন। অপরটি হল মহান আল্লাহর দিকে রুজু করুন।

"হিম্মত ব্যবহার" এর মর্ম হল নিজেকে যথাসম্ভব যতটুকু বাঁচাতে পারেন বাঁচাবেন। আর " আল্লাহর দিকে রুজু" করার মর্ম হল এ জাতীয় পরীক্ষা সামনে এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহর দিকে রুজু করে বলবেনঃ ইয়া আল্লাহ! আপনার খাস রহমতে আমাকে উদ্ধার করুন। আমার চোখকে হেফাযত করার তাউফীক দান করুন। আমার চিন্তা চেতনার হেফাযত করুন। আপনি হেফাযত না করলে তো আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব।

হযরত ইউসুফ আ. এর আদর্শ অবলম্বন করুন

হযরত ইউসুফ আ. যখন পরীক্ষায় নিপতিত হলেন তখন তিনিও একই কাজ করেছেন। অর্থাৎ নিজের উদ্যোগে চেষ্টা চালিয়েছেন। তাইতো যখন যুলাইখা চতুর্দিক হতে দরওয়াজায় তালা লাগিয়ে দিল এবং হযরত ইউসুফ আ. কে গুনাহ (ব্যভিচার) এর দিকে আহবান করল, তখন হযরত ইউসুফ আ. নিজ চোখে দেখছিলেন যে, দরওয়াজাগুলোতে তালা ঝুলছে এবং বের হওয়ার কোন পথ নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ আ. দরওয়াজার দিকে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু দরওয়াজায় তো তালা ঝুলানো। তিনি পলায়ন করবেন কিভাবে? রাস্তাই তো নেই।

কিন্তু যেহেতু হযরত ইউসুফ আ. তাঁর সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব ছিল সেটা করেছেন। অর্থাৎ দরওয়াজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছেন, সেহেতু তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে এটা বলার উপযুক্ত হয়েছেন যে, ইয়া আল্লাহ! আমার সামর্থ্যে যতটুকু ছিল ততটুকুই করেছি। এরচেয়ে বেশি কিছু করার সামর্থ্য আমার নাই। সামনে শুধু আপনার করার কাজ।

ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলাও নিজ কাজ করে দেখিয়েছেন। সমস্ত দরওয়াজার সমস্ত তালা ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছেন।

এটাকেই মাওলানা রূমী রহ. কত সুন্দরভাবে বলেছেন:

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید + خیرہ یوسف وار می باید دوید

অর্থাৎ যদিও এ পৃথিবীতে তোমার কোন রাস্তা ও আশ্রয়স্থল দেখা যাচ্ছে না, চতুর্দিক হতে গুনাহের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তবুও তুমি পাগলের মত এমনভাবে পলায়ন কর যেমন হযরত ইউসুফ আ. পলায়ন করেছেন।

তোমার যতটুকু পলায়নের সামর্থ্য আছে ততটুকুই পলায়ন কর। বাকীটা আল্লাহর কাছে চাও।

যাই হোক, যদি মানুষ এ দুটি কাজ করতে পারে একটি হল নিজ সামর্থ্যের সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করা, আর অপরটি হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দু'আ করা। তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করুন এ পৃথিবীতে সফলতার সবথেকে বড় চাবিকাঠি হল এ দুটো জিনিস।

হযরত ইউনুস আ. এর পদ্ধতি অবলম্বন করুন

আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ. বড় অদ্ভুত কথাবার্তা বলতেন। হযরত বলেন: আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস আ. কে তিন দিন পর্যন্ত মাছের পেটে রেখেছেন। এখন সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ ছিল না। চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে ছিল। ব্যাপারটি হযরত ইউনুস আ. এর সামর্থ্যের বাইরে ছিল। ব্যস ঐ অন্ধকারে তিনি আল্লাহ তাআলাকে ডাকলেন এবং এই কালিমা পাঠ করলেন:

لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

আল্লাহ তাআলা বলেন: যখন ইউনুস আমাকে অন্ধকারে ডাকল তখন فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ "আমি তার ডাক শুনলাম এবং তাকে কঠিন বিপদ থেকে নাজাত দান করলাম আর আমি এভাবেই ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।"[১২]

১২. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৮

ফলশ্রুতিতে তিনদিন পর মাছের পেট হতে বের হয়ে এসেছেন।

আমাদের হযরত ডা: ছাহেব রহ. বলতেন: তোমরা একটু চিন্তা করেই দেখনা মহান আল্লাহ এখানে কী কথাটা বলেছেন যে, আর আমি এভাবেই ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি। তাহলে কি প্রত্যেক মুমিন প্রথমে মাছের পেটে যাবে এরপর সেখানে গিয়ে আল্লাহকে ডাকবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে নাজাত দান করবেন। আয়াতে কারীমার মর্ম কি এটাই? আয়াতে কারীমার মর্ম নিশ্চয়ই এরূপ নয় বরং আয়াতে কারীমার মর্ম হল যেমনিভাবে হযরত ইউনুস আ. মাছের পেটের অন্ধকারে গ্রেফতার হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে তোমরা অন্য কোন অন্ধকারে গ্রেফতার হতে পারো। কিন্তু সেখানেও তোমাদের মুক্তির পথ সেটাই যেটা হযরত ইউনুস আ. অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ খতমে ইউনুস لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ এ কালিমার সাহায্যে আমাকে ডাকলে তোমরা যে কোন ধরনের অন্ধকারেই গ্রেফতার হওনা কেন আমি তোমাদেরকে অবশ্যই নাজাত দান করব।

আমাকে ডাকো

অতএব নফসের চাহিদার অন্ধকার সামনে আসলে, আশপাশের পরিবেশগত অন্ধকার সামনে আসলে, ঐ সময় আমাকে ডাকো, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে এসব অন্ধকার হতে বাঁচান। এখান থেকে পরিত্রাণ দান করুন। এই পূঁতি গন্ধময় নর্দমা হতে বাইরে বের করে দিন। এগুলোর অনিষ্টতা হতে আমাকে হেফাযতে রাখুন। এভাবে দু'আ করলে এটা সম্ভবই না যে, এ দু'আ কবূল হবে না।

দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দু'আর কবূলিয়্যত

দেখুন যখন মানুষ কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করে। উদাহরণস্বরূপ এ দু'আ করল যে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে টাকা-পয়সা দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে অমুক চাকরি দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে অমুক পদ দান করুন।

এমনিতে তো বান্দার যে কোন দু'আই কবূল হয় কিন্তু কবূলিয়্যতের ধরন বিভিন্ন রকম হয়। অনেক সময় বান্দা যে জিনিসটা চায় আল্লাহ তাআলা তাকে সে জিনিসটাই দান করেন। উদাহরণস্বরূপ টাকা-পয়সা চেয়েছিল আর আল্লাহ পাক তাকে সেটাই দান করলেন। অথবা কোন পদ চেয়েছিল আর আল্লাহ পাক তাকে সেটাই দিয়ে দিলেন। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, আল্লাহ তাআলা বুঝেন এ মানুষটি নিজ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এই জিনিসটি কামনা করছে। আমি তাকে সেটা দিলে ঐ জিনিসটি তার জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কথার কথায় কেউ টাকা-পয়সা চাচ্ছে, এখন যদি আমি তাকে সেটা দান করি তাহলে তার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে ফিরআউন হয়ে যাবে, নিজের দ্বীন দুনিয়া সব নষ্ট করবে, এজন্য আমি তাকে পয়সা বেশি দেইনি।

অথবা মনে করুন কেউ কোন পদ মর্যাদা কামনা করল, কিন্তু মহান আল্লাহর জানা আছে যদি এই পদ সে লাভ করে তাহলে কী কী খারাবী দেখা দিবে। এজন্য অনেক সময় ঐ জিনিস দেয়াটা সমীচীন হয় না যেটা সে কামনা করেছিল। যদ্দরুন সেটার পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাকে আরো উত্তম বস্তু দান করেন।

দ্বীনী উদ্দেশ্যে দু'আ অবশ্যই কবূল হয়

কিন্তু যদি কেউ দ্বীন কামনা করে এবং এই দু'আ করে যে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করুন। আমাকে সুন্নাহের উপর অটল রাখুন। আমাকে গুনাহসমূহ হতে রক্ষা করুন।

তো এক্ষেত্রে কি এমন কোন আশংকা আছে যে, দ্বীনের উপর চললে ক্ষতি বেশি হবে আর অন্য কোন পথে চললে ক্ষতি কম? আর আল্লাহ তাআলা দ্বীনের পরিবর্তে ঐ দ্বিতীয় পথে চালাবেন? যেহেতু এরূপ কোন আশংকাই নেই এজন্য ঐ দু'আ যেটা দ্বীনের জন্য কামনা করা হয় যে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে দ্বীন দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে গুনাহসমূহ হতে হেফাযত করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে আপনার আনুগত্যের দৌলত নসীব করুন।

এসব দু'আ তো অবশ্যই কবূল হয়। এসব ক্ষেত্রে কবূল না হওয়ার কোন আশংকাই নেই। এজন্য আমরা যখনই মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করব, তো এই বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করব যে, আমার দু'আ অবশ্যই কবূল হবে।

দু'আর পরে যদি গুনাহ্ হয়ে যায়?

আমাদের হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেনঃ যখন তুমি এ দু'আ করলে যে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে গুনাহ হতে রক্ষা করুন। কিন্তু এ দুআর পর তুমি আবার কোন গুনাহে লিপ্ত হলে, তো বাহ্যত এর অর্থ হল দু'আ কবূল হয়নি। দুনিয়াবী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তো এ উত্তর দেয়া হয়েছিল যে, যে জিনিস বান্দা কামনা করেছিল, যেহেতু সেটা বান্দার জন্য সমীচীন ছিলনা এজন্য আল্লাহ্ তাআলা ঐ জিনিসটা দেননি বরং অন্য কোন ভালো জিনিস দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এক ব্যক্তি এ দু'আ করছে যে, ইয়া আল্লাহ! আমি গুনাহ হতে বাঁচতে চাই। আমাকে গুনাহ হতে আত্মরক্ষার তাউফীক দান করুন। তো এখানেও কি এ উত্তর দিলে চলবে যে, গুনাহ্ হতে বাঁচা ভালো ছিল না! এর থেকে ভালো কোন জিনিস ছিল না!

তাওবার তাওফীক অবশ্যই হয়ে যায়

আসল কথা হল গুনাহ হতে আত্মরক্ষার এ দু'আ কবূল তো অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু এ দুআর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, প্রথমত ইনশাআল্লাহ গুনাহ সংঘটিত হবে না। দ্বিতীয়ত যদি গুনাহ্ হয়েই যায় তাহলে তাওবার তাউফীক অবশ্যই নসীব হবে ইনশাআল্লাহ। এটা হতেই পারে না যে, তাওবার তাউফীক হলো না। সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে এই দু'আ কখনোই বৃথা যাবে না।

আর যদি গুনাহের পর তাওবার তাউফীক লাভ হয়, তাহলে ঐ তাওবা অনেক সময় মানুষকে এত উপরে নিয়ে যায় এবং তার মর্যাদা এত বেশি সমুন্নত হয়ে যায়, অনেক সময় গুনাহ্ না করার সূরতে তার

মর্যাদা ও পজিশন এত বুলন্দ হত না এবং সে এত উপরে উঠতে পারত না। কেননা ভুল হয়ে যাওয়ার পর যখন সে আল্লাহ তাআলার সামনে তাওবা করল, কান্নাকাটি করল, কাকুতি-মিনতি করল তো এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

এরপর আমি তোমাকে উঁচু মাকামে পৌঁছাব

এজন্য আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন: এই দু'আর পরও যদি পদস্খলন হয়ে যায়, গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে মহান আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবেন না। যে আল্লাহ পাক আমার দু'আ কবূল করলেন না! আরে বেকুব! আমি তোমাকে কোন মাকামে পৌঁছাতে চাই তুমি কি তা জান? কেননা গুনাহ সংঘটিত হলে আমি তোমাকে তাওবার তাউফীক দিব। এরপর আমি তোমাকে আমার সাত্তারী, গাফফারী, পর্দাপুশী ও আপন রহমতের অবতরণস্থল বানাব। এ জন্য এই দু'আকে কখনো বেকার ও অনর্থক মনে করবে না।

ব্যস এ দুটি কাজ করতে থাকুন। হিম্মতের সাথে কাজ নিন এবং দু'আ অব্যাহত রাখুন। এরপর দেখুন কী থেকে কী হয় ইনশাআল্লাহু তাআলা।

সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার একমাত্র ব্যবস্থাপত্র

তো বদনেগাহী ও কুদৃষ্টির ব্যাপারে আমি আপনাদের খেদমতে এ কথাগুলো আরয করলাম।

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

শুধুমাত্র কুদৃষ্টি নয়, পৃথিবীর প্রতিটি গুনাহের ক্ষেত্রে হিম্মতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। এটাকে বারবার তাজা করা, মহান আল্লাহর কাছে রুজু করা ও দু'আ করা, উভয়টি জরূরী। শুধু একটার দ্বারা কাজ হবে না। যদি শুধু দু'আ করতে থাকে হিম্মত না করে, তাহলে এটা

অর্জন হবে না। উদাহরণ স্বরূপ জনৈক ব্যক্তি পূর্বদিকে পলায়ন করছে আর সাথে সাথে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করছে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে পশ্চিমে পৌঁছে দিন।

আরে তুমি যাচ্ছ পূর্বদিকে অথচ দু'আ করছ পশ্চিমের! এ দু'আ কিভাবে কবূল হবে? কমপক্ষে প্রথমে নিজের দিক তো পশ্চিমমুখী কর। আর তোমার যতটুকু সাধ্যে আছে সেটা তো কর! এরপর আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ কর ইয়া আল্লাহ! আমাকে পশ্চিমে পৌঁছে দিন। তবেই তো ঐ দু'আ উপকারী হবে। নতুবা সেটা দু'আই নয়। সেটা হল আল্লাহ পাকের সাথে উপহাস মাত্র।

এজন্য প্রথমে দিক ঠিক করুন। হিম্মত করুন। সামর্থ্য অনুসারে কদম বাড়ান। অতঃপর মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র নেই। আর সমস্ত নেকী অর্জনেরও এই একই পথ ও পন্থা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

آنکھوں کی حفاظت کیجئے

চোখের হেফাযত করুন

[২য় অধ্যায়]

বাদ হামদ ও সালাত

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿۴﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ﴿۶﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ﴿۷﴾

নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। যারা তাদের নামাযে আন্তরিক ভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী, যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।[১৩]

ভূমিকা

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয! গত কয়েক জুমুআ ধরে সফলতা প্রাপ্ত ঈমানদারদের গুণসমূহের বয়ান চলছিল। তিনটি গুণের বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ গুণ কুরআনে কারীম এভাবে বর্ণনা করেছে যে, সফলতাপ্রাপ্ত মুমিন তারাই যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। নিজ স্ত্রী ও দাসীগণ ব্যতীত। কেননা এদের মাধ্যমে কামবাসনা পুরা করলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যে সব ব্যক্তি এদের ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে স্বীয় কামবাসনা পুরা করবে তবে তারা হল সীমালংঘনকারী এবং নিজেদের উপর জুলুমকারী।

---

১৩. সূরা মুমিনূন, আয়াত ১-৭

গত জুমুআয় আরয করেছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন দ্বীন দান করেছেন যার মধ্যে আমাদের প্রত্যেক বৈধ চাহিদা পূরণ করার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ বিদ্যমান।

মানুষের জৈবিক চাহিদা মানুষের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই স্পৃহার উপর মহান আল্লাহ কোন বাধ্য বাধকতা আরোপ করেননি। কিন্তু এটা বাতলে দিয়েছেন যে, এই জৈবিক চাহিদা পুরা করার বৈধ পথ হল বিবাহ। এখন যদি মানুষ এ পথে এ চাহিদা পুরা করে তাহলে এটা শুধু জায়িযই নয় বরং সাওয়াবের উপলক্ষ। কিন্তু যদি এর বাইরে অন্য কোন পথ তালাশ করে এবং বিবাহ বহির্ভূত পন্থায় স্বীয় জৈবিক চাহিদা পুরা করতে চায়, তাহলে সেটা হবে সীমালংঘন। এটা ধ্বংসের পথ। ফিতনার পথ। আর এটাই মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

এটা পশ্চিমা সভ্যতা

যেসব সমাজে বিবাহ বহির্ভূত পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করার দরওয়াজা খুলে দেয়া হয়েছে, তারাই চরিত্রগতভাবে এবং সামাজিকভাবে ধ্বংসের শিকার হয়েছে।

আজ সারা পৃথিবীতে পশ্চিমা দুনিয়া ইউরোপ আমেরিকার নষ্ট সভ্যতার ডংকা বাজছে। যেহেতু তারা জৈবিক চাহিদা পুরা করার জন্য বিবাহ বাদ দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে, ফলশ্রুতিতে এই জৈবিক চাহিদা তাদেরকে কুকুর, গাধা এবং বিড়ালের কাতারে নিয়ে গেছে।

কোন কোন এলাকা এমনও আছে যেখানের রেকর্ডবুকে লেখা আছে, এ এলাকার সত্তর থেকে আশি শতাংশ মানুষ জারজ সন্তান! সেখানের পারিবারিক ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। ফ্যামিলি সিস্টেম রসাতলে চলে গেছে। পিতা-পুত্র, মা-কন্যা, ভাই-বোনের চিত্র খতম হয়ে যাচ্ছে।

আজ পশ্চিমা দুনিয়ার চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ চিৎকার করে বলছে যে, আমরা এই দিক দিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে দিয়েছি।

এর একমাত্র কারণ এটাই যে, কুরআনে কারীম জৈবিক চাহিদা পুরা করার যে পবিত্র পথ ও পন্থা বলেছে অর্থাৎ বিবাহ করা। তারা সেটাকে বাদ দিয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করেছে।

এই স্পৃহা কোন সীমানায় থামবে না

আল্লাহ তাআলা এমন ব্যবস্থাপনা বানিয়েছেন যে, যদি এই জৈবিক চাহিদার স্পৃহা বৈধ সীমার মধ্যে থাকে, তবে এই স্পৃহাই মানব বংশ টিকে থাকার স্পৃহা বনে, এবং মানুষকে অনেক উপকার পৌঁছায়। কিন্তু যখন এই স্পৃহা বৈধ সীমানার গন্ডি পেরিয়ে যায়, তখন এই স্পৃহাই এক কুলকিনারাহীন ক্ষুধা ও পিপাসায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। যদি কোন মানুষ স্বীয় চাহিদাকে অবৈধ পন্থায় পূরণ করে, তাহলে সেটার অনিবার্য ফলাফল এটাই হয় যে, সেটা কোন সীমারেখায় আটকে থাকে না। কোন সীমানায় সে শান্তি ও প্রশান্তি পায় না বরং আরো সামনে বেড়ে যায়। তার এই আগ্রাসী ক্ষুধা ও পিপাসা কখনোই মিটেনা, যেমন যদি কোন রোগী "ইসতিস্‌কা" ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় অর্থাৎ এমন ব্যাধি যাতে রোগী বেশি বেশি পানি পান করতে চায়, তাহলে সে হাজার বার পানি পান করলেও আর মটকার পর মটকা পানি নিজের পেটে প্রবেশ করালেও তার পিপাসা কখনোই নির্বাপিত হবে না।

ঠিক একই অবস্থা তখনো হয়, যখন জৈবিক উত্তেজনা তার স্বাভাবিক পর্যায় থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায়, তখন এরা আর কোন সীমানায় আটকে থাকে না।

এরপরও পরিতৃপ্ত হয় না

বর্তমানে পশ্চিমা দুনিয়ায় এটাই হচ্ছে। এক পদ্ধতিতে জৈবিক চাহিদা পুরা করা আরম্ভ করল। কিন্তু পুরো শেষ করতে পারল না। সামনে আরো অগ্রসর হল। এবারো পুরো হল না। আরো সামনে অগ্রসর হল।

এমনকি বর্তমানে পশ্চিমা দুনিয়ার চিত্র হচ্ছে এই যে, সেখানে এমন অসংখ্য ঘটনা সামনে আসছে যে, এখন কোন কোন মানুষের

জৈবিক চাহিদা ঐ সময় পর্যন্ত প্রশমিত হচ্ছে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মহিলার সাথে জৈবিক চাহিদা পুরা করার পর তাকে হত্যাও না করবে।

সীমালংঘনের পরিণতি

পশ্চিমা দুনিয়ার এটা একটা অদ্ভুত দৃশ্য যে, যেখানে তাদের সমাজ নারীকে এত সস্তা করে দিয়েছে যে, পদে পদে নারীর মাধ্যমে যৌন কামনা বাসনা চরিতার্থ করার দরওয়াজাসমূহ উন্মুক্ত। কোন বিধি-নিষেধ বা বাধ্য-বাধকতা নেই। কিন্তু যে সব দেশে নারী এত সহজলভ্য সেসব দেশেই ধর্ষণের ঘটনা সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি। এর কারণ হল পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জৈবিক চাহিদা প্রশমিত করার পরও নফস স্থির হচ্ছে না। এখন মনের মধ্যে এ খেয়াল এসেছে যে, জোরজবরদস্তী করার মধ্যে স্বাদ বেশি। আর জবরদস্তীর চরম পর্যায় হল যে মহিলার সাথে জৈবিক চাহিদা পুরা করা হচ্ছে, তাকে ঐ সময়েই হত্যা করা। এটাও জৈবিক চাহিদার একটি অংশ হয়ে গেছে।

বর্তমানে সেখানের সমাজে এ জাতীয় বীভৎস ঘটনা প্রায় সংঘটিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ অস্থির হয়ে পড়েছেন যে, আমরা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের কোন্ গহ্বরে পৌঁছে দিয়েছি?

কুরআনে কারীমের বক্তব্য হলঃ যারাই এই বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে যৌন কাম বাসনা পুরা করার পথ তালাশ করবে, তারাই সীমালংঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর সীমার বাইরে গিয়েও তার কোন সীমা থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা বলছেনঃ আমি বিবাহের মাধ্যমে তোমাদের জন্য একটি বৈধ পথ সৃষ্টি করে দিয়েছি। সেটা হল বিবাহ। মানুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস এর মাধ্যমে যৌন কামনা পুরা করলে সেটা শুধু জায়িয তাই নয় বরং এটার উপর সে অনেক বড় সাওয়াব ও নেকীও পাবে। অবশিষ্ট সমস্ত পথ হারাম করে দিয়েছেন।

প্রথম পাবন্দী, নজরের হেফাযত

এখন হারাম রাস্তা ও পথ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলা এমন পাহারা বসিয়ে দিয়েছেন যে, যদি এ সব পাহারার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তাহলে মানুষ কখনোই জৈবিক পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে না। এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্বীয় নজর হেফাযতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ

অর্থাৎ "মানুষের নজর শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর।"[১৪]

অর্থাৎ শয়তান মানুষকে এই দৃষ্টির মাধ্যমে ভুল পথে নিয়ে যায় এবং এই দৃষ্টিকে ভুল স্থানে ফেলাতে চায়। ফলশ্রুতিতে মানুষের অন্তরে খারাপ কল্পনা সৃষ্টি হয়। কুচিন্তার উদয় হয়। যদ্দরূন শেষ পর্যন্ত মানুষকে আমলী পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

দৃষ্টি নিচু রাখুন

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ

"আপনি ঈমানদার পুরুষদের কে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।"[১৫]

কেমন যেন এটা বলে দিয়েছেন যে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযতের সর্বপ্রথম পদ্ধতি হল, নজরের হেফাযত করো। এই নজর যেন ভুল স্থানে না পড়ে। কোন বেগানা নারীর উপর স্বাদ নেয়ার উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ব্যভিচারের প্রথম পদক্ষেপ।

---

১৪. তাবারানী, হাদীস নং ১০৩৬২

১৫. সূরা নূর, আয়াত ৩০

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ

অর্থাৎ "চোখ ব্যভিচার করে আর তাদের ব্যভিচার হল কুদৃষ্টি"[১৬]। শরীয়ত এ ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে।

বর্তমানে নজর বাঁচানো মুশকিল

বর্তমান সমাজে যেখানে চতুর্দিকে মানুষের দৃষ্টির কোন আশ্রয়স্থল নেই। চতুর্দিকে ফিতনা ছড়ানো। এক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দৃষ্টিকে নিচু রাখো। এবং নজরের ভুল ব্যবহার করো না।

বর্তমান যুগের যুবক এটা বলবে যে, নজর নিচু রেখে এবং চতুর্দিক হতে চোখ বন্ধ করে চলা খুব কঠিন। কেননা কখনো বিলবোর্ডে ছবি নজরে আসছে। কখনো পত্র-পত্রিকায় ছবি দৃশ্যমান হচ্ছে। যে কোন পুস্তিকা খুললেই ছবি, বাজার থেকে কোন কিছু কিনে আনলেন ঠোঙ্গায় করে সেখানেও ছবি। বেপর্দা নারীদের পদচারণা সর্বত্র দেখা যায়। এজন্য নজর বাঁচানো খুবই মুশকিল।

এই চোখ কত বড় নেয়ামত

কিন্তু এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সামান্য একটু চিন্তা করুন যে, এই চোখ যা আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন এটা কী জিনিস? এটা এমন একটা মেশিন যা আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন। যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন পয়সা ও পরিশ্রম ছাড়াই কাজ করছে। আর এমনভাবে কাজ করছে যে, আপনার যা মনে চায় তাই দেখছেন, যত মজা মনে চায় লুটে নিচ্ছেন।

যদি আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এই মেশিনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার তাউফীক দান করেন, তবে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ

---

১৬. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৫২৬

তাআলা এই ছোট স্থানে কী কারখানা ফিট করে রেখেছেন। যারা চোখের স্পেশালিষ্ট বা বিশেষজ্ঞ তারা কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং হাসপাতালে সারাজীবন লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা জানতে পারেনি যে কারখানা কী? এই কারখানায় কতগুলো পর্দা আছে? কতগুলো ঝিল্লী আছে? আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে কতগুলো পর্দা ফিট করে রেখেছেন? কিন্তু যেহেতু এটা বিনামূল্যে পাওয়া গেছে। এর জন্য কোন টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়নি। কোন মেহনত করতে হয়নি। এজন্য এ নেয়ামতের কোন কদর বা মূল্যায়ন নেই।

চোখের হেফাযতের জন্য পয়সা খরচ করতে প্রস্তুত

যেদিন চোখের দৃষ্টিতে সামান্য পার্থক্য এসে যাবে, তখন আপনার শরীরে কম্পন এসে যাবে না জানি আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় কিনা? আর আল্লাহ না করুন যদি এই দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষ পুরো দুনিয়ার দৌলত খরচ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সে মনে মনে কামনা করে আমি যেন আবারো আমার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। এজন্য যদি আমার সমস্ত টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় তবুও আমি প্রস্তুত। যাতে আমি আমার স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদেরকে দেখতে পারি।

দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। বরং যদি দৃষ্টিশক্তিতে সামান্য পরিবর্তন চলে আসে উদাহরণ স্বরূপ কোন কিছু টেরা অথবা বাঁকা দেখা যাচ্ছে অথবা চোখে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, তখন মানুষ ঘাবড়ে যায় যে, এটা কী হয়ে গেল? অতঃপর চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে দৌড়ে যায় এবং হাজার হাজার টাকা খরচ করে। যাতে করে তার চোখের এ সমস্যা দূর হয়ে যায়। কিন্তু আমার ও আপনার এ মহা নেয়ামত বিনামূল্যে হাসিল হয়েছে। যা মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের খেদমত করে। এর সার্ভিসেরও কোন প্রয়োজন হয় না। তেল ঢালারও কোন প্রয়োজন হয় না।

চোখের মণির অদ্ভূত অবস্থা

আর এই চোখের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বড় অদ্ভূত ব্যবস্থাপনা রেখেছেন।

আমাকে একজন দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন যে, যখন মানুষ আলোতে যায় তখন তার চোখের মণি প্রসারিত হয়। আর যখন অন্ধকারে আসে, তখন তার চোখের মণির শিরাগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। কেননা অন্ধকারে ভালোভাবে দেখার জন্য সেটার সংকোচন জরূরী।

তো ঐ ডাক্তার আমাকে জানিয়েছেন যে, এই সংকোচন ও প্রসারণের কাজে মানুষের চোখের মণি সাত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে। আর এই কাজ আপনা আপনিই হয়। যদি এ কাজ মানুষের হাতে সোপর্দ করা হতো এবং বলা হতো যে, যখন তুমি আলোতে যাবে তখন এই বাটনে চাপ দিবে। আর যখন অন্ধকারে যাবে তখন ঐ বাটনে চাপ দিবে। তবে তোমার চোখ সঠিক কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে কোন মানুষের বুঝে এটা আসত আবার কারো বুঝে আসত না এবং ভুল সময়ে বাটন দাবিয়ে দিত এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাটন দাবিয়ে দিত, তাহলে আল্লাহ পাকই ভালো জানেন তার চোখের কী অবস্থা হত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একটি অটোমেটিক সিস্টেম ঐ চোখের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছেন যে, যেমন প্রয়োজন সে অনুযায়ী তার চোখের মণি প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয়।

চোখ হেফাযতের খোদায়ী ব্যবস্থাপনা

আর এই চোখ এমনই নাযুক ও সংবেদনশীল একটি অঙ্গ যে, সম্ভবত পুরো মানব দেহের মধ্যে এর থেকে বেশি নাযুক কোন জিনিস নেই।

আপনাদের নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা আছে যে, যদি মানুষের চোখে বালু বা মাটির সামান্য কণাও প্রবেশ করে, যেটা দেখাও মুশকিল, যদি সেটা মানুষের চোখে চলে যায়, তবে মানুষ ব্যথায় অস্থির হয়ে যায়। আর এই চোখ মানুষের চেহারার একদম সামনে অবস্থিত। যদি মানুষের সম্মুখ অংশ দিয়ে তার উপর হামলা হয় অথবা কারো সাথে টক্কর হয়,

তো এর চোট সর্বপ্রথম মানুষের চেহারায় পড়ে। কিন্তু চোখের হেফাযতের জন্য আল্লাহ তাআলা দুটি পাহারাদার বসিয়ে দেন। এই মাথার হাড্ডি ও গলার হাড্ডি। এই দুই হাড্ডির দুর্গের মধ্যে মানুষের চোখ রেখে দিয়েছেন। যাতে করে চেহারায় কোন চোট পড়লে হাড্ডি সেটাকে সহ্য করতে পারে এবং চোখ সংরক্ষিত থাকে। আর আল্লাহ তাআলা পলকের দুটি পর্দা চোখের উপর ঢেলে দিয়েছেন যাতে করে কোন ধুলাবালু চোখের ভেতর না যায়। যদি কোন মাটি বা ধুলাবালু উড়ে আসে, তাহলে এই পলক সেটাকে নিজের উপর নিয়ে যাবে এবং চোখকে বাঁচিয়ে দিবে। চরম পর্যায়ে গেলে চোখের উপর চোট পড়ে। নতুবা চোখের হেফাযতের জন্য মহান আল্লাহ এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা বানিয়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষের চেহারার সৌন্দর্যও অটুট থাকে আবার ঐ চোখ নামক নেয়ামতেরও হেফাযত হয়।

চোখের উপর শুধুমাত্র দুটি পাবন্দী

এসব ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলা করে রেখেছেন অথচ এই ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি কোন টাকা পয়সা চাননি যে, তুমি এত টাকা দিলে তোমাকে চোখ দেয়া হবে। বরং এই স্বয়ংক্রিয় মেশিন জন্মের সময় থেকে তোমার নিকট সোপর্দ করেছেন। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, এটা সরকারী মেশিন। এটাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যবহার কর। শুধু কয়েকটি স্থানে একে ব্যবহার করবে না।

এই চোখের দ্বারা আসমান দেখ, জমিন দেখ, ভালো ভালো দৃশ্য দেখ, বাগ-বাগিচা, ফুল ও ফল, সমুদ্র ও নদী দেখ, এগুলোর স্বাদ উপভোগ কর। স্রেফ দুটো জিনিস থেকে বেঁচে থাক। একটা হল কোন বেগানা নারীর দিকে মজা নেয়ার উদ্দেশ্যে দৃষ্টিপাত করবে না, আর কোন মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না।

ব্যস আপনার উপর শুধুমাত্র এ দুটি পাবন্দী বা বাধ্যবাধকতা। বাকী সবকিছু দেখা আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই সরকারী মেশিন যত ইচ্ছা ব্যবহার করুন।

যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার সময় শর্ত লাগিয়ে দেয়া হয়?

এরপরও যদি মানুষ বলে যে, এই কাজ তো খুব মুশকিল।

সমগ্র বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এত বড় ব্যবস্থাপনা আপনাকে দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ না করুন যদি কোন দিন আপনার চোখের পর্দা ফেটে যায় অথবা আল্লাহ না করুন যদি কোন দিন আপনার চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, ঐ সময় যদি আপনাকে এ কথা বলা হয় যে, এই দৃষ্টিশক্তি আপনাকে ফেরত দেয়া হবে ঠিক কিন্তু শর্ত হল অমুক অমুক জিনিস দেখতে পাবে না। ফলে প্রতিউত্তরে ঐ ব্যক্তি বলবে: সারাজীবন এ সব জিনিস না দেখার বন্ড লিখিয়ে নাও। কিন্তু তারপরও আমার দৃষ্টিশক্তি আমাকে ফিরিয়ে দাও। যাতে করে এর মাধ্যমে আমি আমার স্ত্রী-সন্তান, মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও স্বীয় ঘরকে দেখতে পারি।

তখন তো বন্ড লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। যেহেতু দৃষ্টিশক্তি বিদায় নিয়েছে। আর এখন সেটা ফেরত আসার কোন পথ নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ বন্ড লেখানো ছাড়া আপনাকে এ নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন। আর এই নেয়ামত দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা বলছেন: যেখানে এ দৃষ্টি ব্যবহারের জন্য দিয়েছি, শুধুমাত্র সেখানে এটাকে ব্যবহার করবে।

দৃষ্টিপাত সাওয়াবের উপলক্ষও বটে

পক্ষান্তরে সঠিক স্থানে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের আমলনামায় নেকীর স্তূপ লেগে যাবে এবং আখেরাতে বিশাল সাওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া যাবে।

তাইতো হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যদি কেউ তার মাতা-পিতার দিকে একবার রহমতের নজরে তাকায়, তাহলে তার আমলনামায় একটি কবূল হজ্ব ও কবূল উমরার সাওয়াব লেখা হয়।[১৭]

---

১৭. শুআবুল ঈমান বাইহাকী ১০: ২৬৫

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ একজন স্বামী তার ঘরে প্রবেশের পর যদি স্ত্রীর দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় আর স্ত্রীও স্বামীর দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তবে আল্লাহ তাআলা উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান।

সুতরাং সঠিক স্থানে দৃষ্টিপাত করা হলে আল্লাহ পাক প্রচুর নেকী ও সাওয়াব দান করেন।

নজর হেফাযতের একটি পদ্ধতি

আল্লাহ না করুন, যদি মানুষ এই দৃষ্টিকে ভুল স্থানে ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা গাইরে মাহরাম মহিলাদেরকে মজা নেয়ার উদ্দেশ্যে দেখে, তো ঐ দৃষ্টির ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এটা শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর।

বর্তমানে আমরা বলাবলি করি যে, এ যুগে চোখের হেফাযত অনেক কঠিন। কেননা কবি বলেছেন *ڈھونڈنے سے بھی ملتی نہیں آنکھوں کو پناہیں* অর্থাৎ খোঁজ করেও যায়না পাওয়া চোখসমূহের ঠিকানা। কোথায় যাব? কিভাবে বাঁচব? এর থেকে বাঁচার পদ্ধতি হল আপনি এভাবে চিন্তা করবেন যে, যদি আজ আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় আর কেউ আমাকে প্রস্তাব দেয় যে আপনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন কিন্তু শর্ত হল এই দৃষ্টিটাকে কোন গাইরে মাহরাম মহিলাকে দেখায় ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি পাক্কা ওয়াদা করেন, মজবুত অঙ্গীকার করেন এবং লিখিত আকারে দেন, তবেই আপনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। নতুবা পাবেন না। এখন আপনিই বলুন আপনি এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন কি যাবেন না?

কোন্ মানুষ এমন আছে যে এটা লেখা এবং ওয়াদা করার জন্য প্রস্তুত হবে না? আর কোন্ মানুষ এমন আছে যে একথা বলবে যে, যদি আমি বেগানা মেয়েদেরকে দেখতে না পারি, তাহলে আমার আর দৃষ্টিশক্তিরই প্রয়োজন নেই!! কোন মানুষ এমনটি বলবে কি? কখনোই বলবে না।

যদি আপনি ঐ সময় ওয়াদা করা ও লিখে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, তাহলে যে দয়ালু মালিক সেই দৃষ্টিশক্তি আপনার সাথে কোন অঙ্গীকার বা চুক্তি ছাড়াই আপনাকে দিয়ে রেখেছেন আর পরবর্তীতে ঐ মালিক (মহান আল্লাহ) আপনার কাছে এটা আশা করছেন যে, আপনি এই দৃষ্টিকে ভুল পথে ব্যবহার করবেন না। এরপরও নজর হেফাযত আপনার নিকট কেন এত কঠিন মনে হয়? এরপরও কেন আপনি পেরেশান?

এজন্য কুদৃষ্টির কোন উপলক্ষ সামনে আসলে এটা চিন্তা করবেন যে, যদি আমি কুদৃষ্টি করি, তাহলে আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হিম্মতের সাথে কাজ নিন

বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, যখন মানুষ স্বীয় দৃষ্টিশক্তিকে মহান আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার কাজে ব্যবহার করে তখন বুঝতে হবে যে, সে আসলে চক্ষুষ্মান নয় বরং সে অন্ধ। তার অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

অর্থাৎ “আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে থেকেছে সে আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট হবে।”[১৮]

এজন্য মানুষের উচিত এই অঙ্গীকার করা যে, আমি এই দৃষ্টিকে ভুল স্থানে ব্যবহার করবনা। আল্লাহ তাআলা এই হিম্মত ও দৃঢ় মনোবলের মধ্যে অনেক শক্তি রেখেছেন। মানুষের এই হিম্মত হল রাবারের মত। যত ইচ্ছা লম্বা করুন। যখন মানুষ তার হিম্মতকে ব্যবহার করে তখন মহান আল্লাহ তার হিম্মতের মধ্যে বরকত ও উন্নতি দান করেন।

---

১৮. সূরা ইসরা, আয়াত ৭২

সারকথা

যাই হোক, এই দৃষ্টির উপর দুটি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। একটি হল গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্বাদের দৃষ্টিতে দেখা। আর অপরটি হল কোন মুসলমানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা। কোন মুসলমানের উপর তাচ্ছিল্যের সাথে তাকানো এটাও চোখের গুনাহ।

এই উভয় গুনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত করলে ইনশাআল্লাহ জীবন ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা চেতনা ও মন মানসিকতাও পবিত্র হয়ে যাবে। সর্বোপরি মহান আল্লাহও হবেন আমাদের উপর রাযী ও সন্তুষ্ট। এর পাশাপাশি আখেরাতের প্রস্তুতিও হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি এমন পন্থা অবলম্বন করা হয় যে, মহান আল্লাহর দেয়া মেশিন (চোখ)কে পাইকারী হারে ব্যবহার করে, এর উপর কোন বিধিনিষেধ বা বাধ্যবাধকতা আরোপ না করে, তাহলে এই চোখই মানুষকে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত করার কারণ হবে এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তির উপযুক্ত বানিয়ে দিবে।

এজন্য চোখের হেফাযত খুবই জরুরী। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই চোখের গুনাহ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

آنکھیں بڑی نعمت ہیں

চোখ অনেক বড় নেয়ামত

(৩য় অধ্যায়)

বাদ হামদ ও সালাত।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿۴﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ﴿۶﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ﴿۷﴾

নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকল থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।[১৯]

ভূমিকা

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয! গত দুই জুমুআ হতে সূরা মুমিনূনের পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ আয়াতের উপর বয়ান চলছে। যার সারকথা হল মহান আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তিদের সফলতা লাভের জন্য যে সব গুণ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি গুণ হল

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۵﴾

অর্থাৎ “আর যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।”

যার সারকথা হল আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মন-মানসিকতায় জৈবিক চাহিদা রেখেছেন। আর যেহেতু ইসলাম একটি প্রকৃতিগত ধর্ম, এজন্য এ জৈবিক চাহিদা পুরা করার জন্য মহান আল্লাহ হালাল রাস্তা ঠিক করে দিয়েছেন। সেটাই হল বিবাহ। এই বিবাহের মাধ্যমে মানুষ

১৯. সূরা মুমিনূন, আয়াত ১-৭

স্বীয় যৌন কামনা বাসনা প্রশমিত করে। এটা শুধু যে জায়িয তাই নয় বরং সাওয়াব ও নেকীর বিরাট উপলক্ষও বটে। কিন্তু এই যৌন কামনা পুরা করার জন্য যদি কোন নারী ও পুরুষ বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন পথ অবলম্বন করে, তবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী। এক্ষেত্রে কুরআনে কারীম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করেছে।

فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

অর্থাৎ "তারাই হবে সীমালংঘনকারী।" কিন্তু এর ভাবার্থের মধ্যে অনেক খারাবী অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। তাইতো বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় যে ব্যক্তি স্বীয় জৈবিক চাহিদা ঠান্ডা করতে চায় সে সমাজের মধ্যে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।

এই হল উল্লেখিত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সার নির্যাস।

প্রথম নির্দেশ : নজরের হেফাযত

জৈবিক চাহিদা পূরণের সমস্ত অবৈধ পথকে শরীয়ত হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি এমন সুন্দর পরিবেশও সৃষ্টি করে দিয়েছে যাতে বিবাহের নির্দেশের উপর আমল করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে নানা প্রকারের বদরসম ও কুপ্রথা এই বিবাহ নামক মহাপবিত্র ইবাদতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে এটাকে মুশকিল বানিয়ে দিয়েছি।

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত দরওয়াযা বন্ধ করে দিয়েছেন যা মানুষ কে যেনা ব্যভিচারের পথে নিয়ে যায়।

এজন্য সর্বপ্রথম নির্দেশ হল নজরের হেফাযত করতে হবে। দৃষ্টিকে পবিত্র রাখতে হবে। এটাকে ভুল স্থানে ব্যবহার করা যাবে না। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مَّسْمُوْمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ

অর্থাৎ নজর শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর।[২০]

---

২০. তাবারানী, হাদীস নং ১০৩৬২

অনেক সময় স্রেফ একটি দৃষ্টি মানুষের অন্তরের হালতকে নষ্ট করে ফেলে। এর মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তার চিন্তা চেতনা ও মন-মানসিকতাকে কলুষিত ও দূষিত করে ফেলে। এজন্য শরীয়ত প্রথম পাহারা মানুষের চোখের উপর বসিয়েছে।

চোখ অনেক বড় নেয়ামত

এই চোখ আল্লাহ তাআলার এত বড় নেয়ামত যে, যদি কোন মানুষ দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাহলে সে লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেও এ নেয়ামত হাসিল করতে পারবে না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঐ নেয়ামত বিনামূল্যে দান করেছেন। এজন্য এ নেয়ামতের মূল্যায়ন হয় না। আর এ নেয়ামত আমাদের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকে। এটা এমনই নাযুক একটি অঙ্গ যে, সামান্য একটি চুল পড়লে বা চুলকানি হলেও এটা বেকার হয়ে যায়। অথচ এত নাযুক মেশিন পুরো যিন্দেগী মানুষের সঙ্গ দেয়, না তার সার্ভিসের প্রয়োজন হয়, না তেল বা পেট্রোলের জরূরত হয়। বরং মহান আল্লাহ অটোমেটিক ব্যবস্থাপনার অধীনে এটার সার্ভিসও করতে থাকেন এবং তাকে খাদ্যও পৌঁছাতে থাকেন। তাইতো যে লোকমা আমরা ক্ষুধা মেটানোর জন্য খাই ঐ লোকমার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা শরীরের প্রতিটি অংশকে খাদ্য পৌঁছাতে থাকেন। এমনিভাবে চোখকেও পৌঁছান।

চোখও ব্যভিচার করে

এই চোখ তোমাদেরকে এজন্য দেয়া হয়েছে যাতে করে তোমরা এর মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণ করতে পারো এবং নিজেদের কাজ বের করতে পারো।

এই চোখের উপর শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ে বিধিনিষেধ দেয়া হয়েছে যে, ঐ সব জিনিস দেখবে না। কোন বেগানা নারীকে স্বাদ গ্রহণের নিয়্যতে দেখবে না। এমনটি করলে গুনাহ হবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ

অর্থাৎ চোখও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল দেখা।[২১]

স্বাদের উদ্দেশ্যে কোন গাইরে মাহরাম নারীর দিকে তাকানোই বদনেগাহী। এটাকে শরীয়তে নাজায়িয ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা যখন আমাদের দৃষ্টি সংরক্ষিত হবে, তখন আমাদের চিন্তাধারাও পবিত্র হবে। জযবাসমূহও পরিচ্ছন্ন হবে। ফলশ্রুতিতে আমাদের আমলসমূহও পরিশুদ্ধ হবে।

লজ্জাস্থানের হেফাযত চোখের হেফাযতের উপর নির্ভরশীল

তাইতো কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۞ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এবং ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন যেন তারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।”[২২]

এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ এটা বাতলে দিলেন যে, লজ্জাস্থান হেফাযতের একমাত্র পথ নজর বা দৃষ্টির হেফাযত। নজর সংরক্ষিত তো লজ্জাস্থানও সংরক্ষিত। যেনা-ব্যভিচার থেকে নিরাপদ।

এটা কোন মোল্লা মৌলভীর নির্দেশ নয়। কোন প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া বা সন্ত্রাসীর হুকুম নয় বরং এটা আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহর নির্দেশ। যা তিনি কুরআনে কারীম এর মধ্যে বয়ান করেছেন।

---

২১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৫২৬; বাইহাকী, হাদীস নং ২৩৫৯

২২. সূরা নূর, আয়াত ৩০-৩১

দুর্গ অবরোধ

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা এ বিধানের উপর আমল করেছে, অতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে ফিতনা-ফাসাদ হতে হেফাযত করেছেন।

আমি আমার মরহুম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. থেকে এ ঘটনা শুনেছি। যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

হযরত উমর ফারূক রাযি. এর খিলাফতের যুগে হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি. যিনি আশারায়ে মুবাশশারাহ অর্থাৎ পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন এবং অনেক উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী, সিরিয়া বিজেতা। কেননা সিরিয়ার অসংখ্য অঞ্চল তাঁর মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ার গভর্ণর হয়েছেন। তাঁরই ঘটনা। একবার তিনি কোন অমুসলিম দুর্গে আক্রমণ করলেন এবং ঐ দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। অবরোধ লম্বা হয়ে গেল। দুর্গ জয় করা যাচ্ছিল না। দুর্গে অবরুদ্ধ খ্রীস্টানরা যখন দেখল যে, মুসলমানগণ অত্যন্ত মযবূতীর সাথে দুর্গ অবরোধ করে আছেন, তখন তারা একটি ষড়যন্ত্র করল। সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা মুসলমানদেরকে বলব যে, আমরা দুর্গের দরওয়াযা আপনাদের জন্য খুলে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের বাহিনী নিয়ে শহরে প্রবেশ করুন।

সাথে সাথে তারা এ চক্রান্তও করল যে, শহরের দরওয়াযা যেদিক দিয়ে খোলা হত ঐদিকে অনেক লম্বা বাজার ছিল। যার উভয় পার্শ্বে দোকান ছিল। আর ঐ বাজার শাহী মহলে গিয়ে শেষ হত।

ঐ খ্রীস্টানরা বাজারের উভয় পার্শ্বে সুন্দরী নারীদেরকে সুসজ্জিত করে প্রত্যেক দোকানে এক এক জন নারীকে বসিয়ে দেয়। আর এ নারীদেরকে এই নির্দেশনা দিয়ে দেয়া হয় যে, যদি মুজাহিদগণ প্রবেশ করার সময় তোমাদের গায়ে হাত দিতে চায় বা অন্য কিছু করতে চায় তবে তাদেরকে বাঁধা দিবে না। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তাদের পরিকল্পনা ছিল এরূপ যে, মুজাহিদগণ তো হিজাযের বাসিন্দা। মাসের

পর মাস তাঁরা নিজেদের স্ত্রীদের থেকে দূরে। ভিতরে প্রবেশ করার পর যখন হঠাৎ করে এমন সুন্দরী নারী তাঁদের দৃষ্টিগোচর হবে তখন তাঁরা এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং এক পর্যায়ে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়বে। ঠিক ঐ সময় আমরা পিছন দিক দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে বসব।

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি হতে বাঁচুন

ষড়যন্ত্র পাকিয়ে দুর্গ অধিপতি হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি. এর নিকট পয়গাম পাঠাল যে, আমরা পরাজয় স্বীকার করছি। এখন আমরা দুর্গের দরওয়াযা আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি। আপনি আপনার সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করুন।

যখন হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি. এ পয়গাম পেলেন, আসলে আল্লাহ পাক যখন ঈমান দান করেন তখন ঈমানী বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিও দান করেন।

হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

অর্থাৎ "তোমরা মুমিন ব্যক্তির দূরদৃষ্টি হতে বেঁচে থাকো। কেননা সে তো আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।"[২৩]

এ পয়গাম পাওয়া মাত্রই হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি. সতর্ক হয়ে গেলেন যে, এতক্ষণ পর্যন্ত এ লোকগুলো লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল, দরওয়াযা খুলছিল না এখন হঠাৎ কী হয়ে গেল যে, এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুর্গের দরওয়াযা খোলার প্রস্তাব পেশ করছে? আর আমাদের সৈন্যদের কে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দূরভিসন্ধি আছে।

---

২৩. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩১২৭

পুরো সৈন্যবাহিনী বাজার পার হয়ে গেল

ফলশ্রুতিতে তিনি সমস্ত সৈন্যদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন ও বললেন: আল্লাহর শোকর যে শত্রুবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। এখন তারা আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশের দাওয়াত দিচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাদের সামনে কুরআনে কারীমের একটি আয়াত পাঠ করছি। আপনারা এ আয়াত পাঠ করতে করতে ও আয়াতের উপর আমল করতে করতে প্রবেশ করবেন। তখন তিনি তিলাওয়াত করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ

তরজমা: "আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখে ও স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য পরিশুদ্ধতর।"[২৪]

ফলশ্রুতিতে পুরো সেনাবাহিনী দুর্গের ভিতরে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, তাঁদের দৃষ্টি ছিল অবনত, আর এমতাবস্থাতেই পুরো বাজার পার হয়ে চলে গেল, এবং শাহী মহল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কেউ ডানে বামে চোখ তুলেও তাকালেন না, যে দোকানে কী ফিতনা তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে ইসলাম গ্রহণ করল

যখন শহরবাসীগণ এ দৃশ্য দেখলেন, তখন পরস্পরে বলতে লাগল এরা কোন্ মাখলূক? কেননা কোন বিজয়ী সেনাবাহিনী যখন কোন শহরে প্রবেশ করে, তখন বুক টান করে প্রবেশ করে। স্বাধীনভাবে প্রবেশ করে ও লুটপাট চালায়। নারীর সতীত্ব ভূলুণ্ঠিত করে। অথচ এই অদ্ভুত সেনাবাহিনী এমনভাবে প্রবেশ করল যে, এদের আমীর ছাহেব বলে দিয়েছেন, নজর নিচু রাখতে হবে। ফলে সবার দৃষ্টি নিচু ছিল। এমতাবস্থায় পুরো সেনাবাহিনী বাজার পার হয়ে যায়। শহরের অসংখ্য

---

২৪. সূরা নূর, আয়াত ৩০

মানুষ এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে মুসলমান হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাউফীক দান করেন।

ইসলাম কি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে?

কেউ কেউ বলে থাকে ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে? তাদের একথা সঠিক নয়। বরং বাস্তব কথা হল, ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর উন্নত ব্যবহার ও অনুপম চরিত্র মাধূরী দ্বারা।

যাই হোক, দৃষ্টি অবনত রাখার এই আমল তাঁদেরকে শুধুমাত্র শারীরিক ও জৈবিক ফিতনা হতেই নিরাপদ রাখেনি, বরং এর মাধ্যমে শত্রুবাহিনীর ষড়যন্ত্র ও কূটচাল হতেও মহান আল্লাহ তাঁদেরকে হেফাযত করেছেন।

শয়তানের হামলা হয় চতুর্মুখী

আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলতেন: যখন মহান আল্লাহ শয়তানকে জান্নাত হতে বের করে দিলেন, তখন সে মহান আল্লাহর সামনে চ্যালেঞ্জের আন্দাযে বলল: যখন আপনি আমাকে জান্নাত থেকে বের করেই দিলেন আর আমার এই দু‘আও আপনি কবূল করেছেন যে, আমি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকব, তবে আপনি শুনে রাখুন, যে আদমের কারণে আমি জান্নাত হতে বিতাড়িত হলাম তাঁর সন্তানদেরকে আমি এমনভাবে পথভ্রষ্ট করব যে

لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ۝۱۷

অর্থাৎ “আমি তাদের সামনে দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে ও বাম দিক দিয়ে হামলা করব। অর্থাৎ চতুর্মুখী আক্রমণ চালাব আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।”[২৫]

---

২৫. সূরা আরাফ, আয়াত ১৭

বুঝা গেল যে, শয়তান চারো পার্শ্ব পরিবেষ্টন করে আছে।

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. লিখেন: শয়তান দুটি দিকের কথা বলতে ভুলে গেছে। একটা হল উপর দিক, আর আরেকটা হল নিচের দিক। এজন্য সে চতুর্পাশ দিয়ে আক্রমণ করে।

তার থেকে আত্মরক্ষার উপায় হল উপর দিক অথবা নিচের দিক। উপর দিকের মর্ম হল মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, তাঁর দিকে রুজু করা, এবং এ বলে দু'আ করা যে ইয়া আল্লাহ! শয়তান আমাকে চারো দিক হতে পরিবেষ্টন করে আছে। আপনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন।

তো উপরের পথ তো শয়তান থেকে এজন্য সংরক্ষিত যে, সেটা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম ও উপলক্ষ।

নিচের পথ সংরক্ষিত

আর নিচের পথ শয়তান থেকে এজন্য সংরক্ষিত, যাতে আমরা নজর নিচু করে চলতে পারি। ডান, বাম, অগ্র-পশ্চাত এই চারদিক থেকে শয়তানী আক্রমণ হতে পারে, কিন্তু নিচের দিক শয়তানী আক্রমণ হতে সংরক্ষিত। আমরা নজর নিচু করে চললে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করবেন। এজন্যই মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন নজর নিচু করে চলার জন্য। যাতে করে ফিতনা এড়ানো যায়।

যাই হোক, এই দৃষ্টির ফিতনা মানুষের বাতেনী আখলাককে বাতেনী কাইফিয়্যাতকে ধ্বংস করে দেয়।

আফসোসের কথা হল আমাদের সমাজে বর্তমানে এই বালা এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, সম্ভবত আল্লাহর কোন বান্দাই এর থেকে নিস্তার পাচ্ছেন না। একটি মাসআলা তো এই যে, চতুর্দিকে নজরকে আকৃষ্ট করার ও প্রলুব্ধ করার উপকরণ ছড়িয়ে আছে। সবদিক হতে চোখের যেনার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে।

এর কারণ হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐ সমাজে পর্দা ছিল, হিজাব ছিল, হায়া ছিল, শরম ছিল এবং মনুষ্যত্বের উন্নত গুণাবলী তাঁদের মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার জাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যদ্দরূন কোন দিকে তাকানোর পথ নেই।

আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিতির ধ্যান

দ্বিতীয় বিষয় হল আমাদের হিম্মত দুর্বল হয়ে গেছে। তাই একজন মুমিন ব্যক্তির ভিতরে মহান আল্লাহ যে যোগ্যতা রেখেছেন সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিতির ধ্যানকে সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে।

আজ চতুর্দিকে বদনেগাহী বা কুদৃষ্টির ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে। আর আমাদের ঈমানী জযবাতেও ভাটা পড়েছে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন শরীয়তের যে বিধানের উপর আমল করা যত মুশকিল হয়ে যায়,ততই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হয় এবং ঐ বিধানের উপর আমলের সওয়াবও সে অনুপাতে বেশি দেয়া হয়।

আচমকা দৃষ্টি মাফ

আরেকটা কথা হল যদি প্রথমবার কোন গাইরে মাহরাম ব্যক্তির উপর আচমকা নজর পড়ে যায় তবে আল্লাহ তাআলার নিকট সেটা মাফ। এর উপর কোন গুনাহ নেই। এক্ষেত্রে বিধান হল নজর পড়া মাত্রই সেটা সরিয়ে ফেলতে হবে। হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : لَكَ النَّظْرَةُ الأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ অর্থাৎ প্রথমবারের দৃষ্টি (অনিচ্ছাকৃত) তোমার জন্য অনুমতি আছে অর্থাৎ এতে কোন গুনাহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বারের দৃষ্টি (ইচ্ছাকৃত) তোমার জন্য অনুমতি নেই যেহেতু এটা গুনাহ ও নিষিদ্ধ।[২৬]

এজন্য কোন বেগানা নারী বা সুশ্রী বালকের উপর দৃষ্টি পড়া মাত্রই আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মনে করে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। আর এ

---

২৬. শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৩২৫

কথা চিন্তা করবে যে, কুদৃষ্টির সময় যদি মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে আমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন আর আমাকে বলা হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কুদৃষ্টি পরিত্যাগ না করবে অতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে না, তখন তো আমি হাজার বার ঐ বদনেগাহী ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব।

যদি আমি ঐ সময়ে এই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য প্রস্তুত হতে পারি, তাহলে আজকেও এটা ভেবে প্রস্তুত হতে পারি যে, আমার মালিক আমাকে এ গুনাহ হতে নিষেধ করেছেন।

এটা নিমকহারামী

মানুষের এটা চিন্তা করা উচিত যে, যে মহান অনুগ্রহশীল সত্ত্বা আল্লাহ বিনা দরখাস্তে বিনা মূল্যে এ চোখ নামক মহা নেয়ামত আমাকে দান করলেন, তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে এটাকে ব্যবহার করা তো অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার এবং নিমকহারামীও বটে।

এই নিমকহারামী থেকে বাঁচার জন্য পাক্কা নিয়্যত করতে হবে যে, আমি আর এ গুনাহ করব না। এরপর সাহস করে দৃষ্টিকে সরিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা মানুষের সাহসের মধ্যে অনেক শক্তি রেখেছেন। মানুষ সাহস করলে পাহাড়ও ডিঙ্গাতে পারে। কাজেই এই হিম্মত ও সাহসকে ব্যবহার করুন এবং নজরকে হটিয়ে নিন।

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা কে ভয় করে ভুল স্থান হতে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ঈমানের এমন রূহানী স্বাদ দান করবেন যার সামনে কুদৃষ্টির স্বাদ কিছুই নয়।

আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ

এছাড়া আল্লাহ তাআলার নিকট খুব বেশি বেশি দু'আ করতে হবে: ইয়া আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমার হিম্মত কম। ইয়া আল্লাহ! যখন আপনি এ কাজটাকে গুনাহ আখ্যায়িত করেছেন তখন আপনার রহমতে

আমাকে সাহসও দান করুন। যাতে করে আমি আপনার হুকুমের উপর আমল করতে পারি এবং আপনার দেয়া এ নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। ভুল স্থানে ব্যবহার হতে বেঁচে থাকতে পারি। বিশেষ করে ঐ সময় যখন মানুষ বাসা হতে বের হয়। যেহেতু সে তখন ফিতনার পরিবেশে যাচ্ছে, না জানি কত ফিতনা সামনে আসে। এজন্য বাসা থেকে বের হওয়ার পূর্বে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করবে যে, ইয়া আল্লাহ! আমি তো অঙ্গীকার করছি যে, আপনার দেয়া এ নেয়ামত অর্থাৎ চোখকে ভুল স্থানে ব্যবহার করব না কিন্তু আমার নিজের উপর ভরসা নাই। আর আমি ঐ সময় পর্যন্ত বাঁচতে পারবনা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাহায্য শামিল না হবে। এজন্য হে আল্লাহ! আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে এই গুনাহ হতে রক্ষা করুন।

এই দু'আ করে ঘর থেকে বের হোন এবং হিম্মতকে কাজে লাগান। আর কখনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা ও ইসতিগফার করুন। মানুষ এভাবে মেহনত করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহর রহমতে আশা করা যায় যে, সে এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে হেফাযতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে ও আপনাদেরকেও এর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

زبان کی حفاظت کیجئے

যবানের হেফাযত করুন

(১ম অধ্যায়)

بسم الله الرحمن الرحيم

তিনটি পবিত্র হাদীস :

১.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনে বিশ্বাসী তার উচিত হয়ত ভালো কথা বলবে অথবা চুপ থাকবে।”[২৭]

২.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

এই দ্বিতীয় বর্ণনাটিও হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “একজন মানুষ চিন্তা ভাবনা ছাড়া যখন কোন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, তখন ঐ কথার কারণে সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের এমন অতল গহবরে নিক্ষেপ করা হয় যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান।”[২৮]

---

২৭. সহীহ বুখারী, আদব অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪৭৫

২৮. সহীহ বুখারী, যবান হেফাযত অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪৭৭

৩.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالٰى لاَ يُلْقِي بِهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا يَهْوٰى بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ.

এই হাদীসটিও হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "অনেক সময় মানুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কোন কথা বলে অর্থাৎ এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে যা আল্লাহ তাআলা কে খুশী করে। যখন সে এ কথাটা বলে তখন তো সে এটার গুরুত্ব অনুমান করতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহ এই কালিমার বদৌলতে জান্নাতে তার দারাজাত উঁচু করে দেন। আবার এর বিপরীতে অনেক সময় মানুষ মুখ দিয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করে যা আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে আর সে লাপরোয়া ভাব নিয়ে সেটা বলে ফেলে অথচ সে মন্দ কথাটাই তাকে জাহান্নামে নিয়ে নিক্ষেপ করে।"[২৯]

যবানের হেফাযত করুন

উপরে উল্লেখিত তিনটি হাদীসেই যবানের হেফাযতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে এ বিষয়েও তাকীদ করা হয়েছে যেন মানুষ যবানের গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং এই যবানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজে ব্যবহার করে এবং মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক বিষয়সমূহ হতে যবানকে হেফাযত করে। যেমনটি আমি পূর্বেও আরয করেছি যে, আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি জরূরী হল গুনাহ থেকে বাঁচা। কোনভাবেই যেন গুনাহ না হয়। এই গুনাহসমূহের মধ্যে এখন যবানের গুনাহের বয়ান শুরু হয়েছে।

২৯. সহীহ বুখারী, যবান হেফাযত অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪৭৮

যেহেতু যবানের গুনাহটি এমন যে, অনেক সময় মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করে বেপরোয়াভাবে কথাবার্তা বলে ফেলে। আর সেই কথা তার জন্য প্রচন্ড আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যবানকে দেখে শুনে ব্যবহার করো। ভালো কোন কথা বলার থাকলে বলো নতুবা চুপ থাকো।"[৩০]

যবান এক বিশাল নেয়ামত

এই যবান যেটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন এটার ব্যাপারে একটু চিন্তা করুন এটা কত বড় নেয়ামত!! কত বড় পুরস্কার!! বলার এমন মেশিন দান করেছেন যা জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সঙ্গ দেয়। চলতে থাকে, আর এমনভাবে চলতে থাকে যে, মানুষ একটু ইচ্ছা করল ব্যস ওদিকে সে কাজ শুরু করে দিল। এখন যেহেতু এ মেশিনকে অর্জন করার জন্য কোন মেহনত বা পরিশ্রম করতে হয়নি, পয়সা খরচ করতে হয়নি; এজন্য এ নেয়ামতের কদর বুঝে আসে না। চাওয়া ছাড়াই বসে বসে নেয়ামত পাওয়া যায়। সেটার মূল্যায়ন হয় না। এখন এই যবানও বসে বসে না চেয়েই আমরা পেয়ে গেছি। অথচ সে ধারাবাহিক ভাবে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। আমরা যা চাই সেটা এ যবানের সাহায্যে বলে ফেলি।

এ নেয়ামতের কদর ঐ সব মানুষকে জিজ্ঞেস করুন যারা এ নেয়ামত হতে বঞ্চিত। যবান বিদ্যমান কিন্তু কথা বলার শক্তি নাই। মানুষ কোন কথা বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না। অন্তরে জয্বা পয়দা হচ্ছে কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারছে না। তাকে জিজ্ঞেস কর সে বলবে যবান কত বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলার কত বড় পুরস্কার।

---

৩০. সহীহ বুখারী, যবান হেফাযত অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪৭৫, ৬৪৭৬

যদি যবান বন্ধ হয়ে যায়

এ কথাটা একটু চিন্তা করুন আল্লাহ না করুন যদি যবান কাজ করা বন্ধ করে দেয়, এখন আপনি বলতে চাচ্ছেন কিন্তু বলতে পারছেন না ঐ সময় কেমন অসহায় অবস্থা হবে?

আমার একজন স্নেহাস্পদ সাম্প্রতিক সময়ে যার অপারেশন হয়েছে, তিনি বললেন যে, অপারেশনের পর কিছু সময় এমন অবস্থায় পার হয়েছে যে, পুরো শরীর অনুভূতিহীন ছিল। প্রচণ্ড পিপাসা লাগছিল। সামনে মানুষ বসা, আমি তাকে বলতে চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে পানি পান করাও। কিন্তু যবান চলছে না। আধা ঘণ্টা এভাবে পার হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি বলতেন: আমার পুরো জীবনে ঐ আধাঘণ্টা সময় যতটুকু যন্ত্রণাদায়ক ছিল, এমন দুর্বিষহ মুহূর্ত আমার উপর দিয়ে আর কখনো যায়নি।

যবান আল্লাহর আমানত

আল্লাহ তাআলা যবান ও মস্তিষ্কের মাঝে এমন কানেকশন রেখেছেন যে, যখনই মস্তিষ্ক এই ইচ্ছা করে যে, অমুক কথা মুখ দ্বারা উচ্চারণ করবে, তখনই যবান সেটা আদায় করে দেয়।

কিন্তু যদি মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া হত যে, তুমি নিজে এটাকে ব্যবহার কর, তাহলে এর জন্য প্রথমে এই ইলম শিখতে হত যে, যবানের কোন্ হরকত দ্বারা "الف" আলিফ বের হয়। যবানকে কোথায় নিয়ে গিয়ে "بِ" বের করবে? তাহলে মানুষ এক মুসীবতে পড়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এ বিষয়টা রেখেছেন যে, যে শব্দটা সে যবান দ্বারা উচ্চারণ করতে চায় সেটা উচ্চারণ করা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে যবান থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু এটা ব্যবহার করতে গিয়ে একটু চিন্তা করুন যে, আপনি কি নিজে এই মেশিন কিনে এনেছিলেন? না, বরং এটা তো আল্লাহর দান। তিনিই আপনাদেরকে দান করেছেন। এটা তোমাদের মালিকানাধীন কোন বস্তু নয় বরং আপনাদের কাছে আমানত। আর যেহেতু এটা আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, সেহেতু এটাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার

করতে হবে। এমনটি যেন না হয় যে, যা মনে আসল তাই বলে দিল। বরং আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী হলে সেটা মুখে আদায় করবে। নতুবা বের করবে না। এটা সরকারী মেশিন, এটাকে মহান আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

যবানের সঠিক ব্যবহার

আল্লাহ তাআলা এ যবানটাকে এমন বানিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এ যবানটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যেমনটি আপনি এইমাত্র একটি হাদীস পাঠ করলেন যে, জনৈক ব্যক্তি লাপরোয়া ভাব নিয়ে একটা কথা যবান থেকে বের করল, কিন্তু সেই কথাটা ভালো ছিল। তাহলে সেই কালিমার কারণে মহান আল্লাহ না জানি তার দারাজাত কতটুকু উঁচু করে দেন। এবং সে কত বেশি সওয়াব ও নেকী অর্জন করে।

যখন একজন মানুষ কাফের থেকে মুসলমান হয়, তখন সে এই যবানের মাধ্যমেই হয়। যবানের সাহায্যে সে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে।

اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰه إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। এবং আমি একথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

এই কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পূর্বে সে কাফির ছিল, কিন্তু এটা পড়ার পর সে মুসলমান হয়ে গেল। প্রথমে জাহান্নামী ছিল, এখন জান্নাতী হয়ে গেল। প্রথমে আল্লাহ পাকের ক্রোধের পাত্র ছিল, এখন প্রিয়পাত্র হয়ে গেছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতে ইজাবতের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (উম্মত দুই প্রকার, উম্মতে দাওয়াত, ২. উম্মতে ইজাবত। উম্মতে দাওয়াত বলতে বুঝায় বিশ্বের সমস্ত অমুসলিমকে। আর উম্মতে ইজাবত বলতে বুঝায় মুসলমানদেরকে- অনুবাদক)

এই মহাবিপ্লব তার জীবনে এসেছে মাত্র একটি কালিমার বদৌলতে। যা সে যবান দ্বারা আদায় করেছে।

যবানকে যিক্‌র দ্বারা তরুতাজা রাখুন

ঈমান আনার পর একবার যবান দ্বারা বলে দিল “সুবহানাল্লাহ”। তো হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ এর দ্বারা আমলের দাড়িপাল্লা অর্ধেক ভরে যায়।

দেখুন ছোট্ট কালিমা, অথচ সওয়াব কত বেশি। অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ এ দুটি কালিমা যবানে তো হাল্কা। যেহেতু অল্প সময়ে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন আমলের দাড়িপাল্লায় এর ওজন অনেক বেশি হবে আর আল্লাহর কাছেও এ দুটি কালিমা খুব প্রিয়।[৩১]

যাই হোক আল্লাহ তাআলা এ মেশিনটি এমন বানিয়েছেন যে, যদি এর দিক সামান্য পরিবর্তন করে দেয়া হয়, আর সঠিকভাবে একে ব্যবহার করা আরম্ভ করা হয়, তাহলে দেখবেন এটা আপনাদের আমলনামা কিভাবে বৃদ্ধি করে এবং আপনাদের জন্য জান্নাতে কিভাবে ঘর বানায় এবং কিভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি আনয়ন করে।

সুতরাং এ যবানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র করুন এবং আল্লাহর যিকর দ্বারা এ যবানকে তরুতাজা রাখুন। এরপর দেখবেন জান্নাতে আপনাদের মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি পায়।

একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ আমলটি ভাল? উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “তোমার যবান যেন আল্লাহ তাআলার স্মরণে তরুতাজা থাকে, চলতে ফিরতে উঠতে বসতে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র করতে থাক”।[৩২]

---

৩১. সহীহ বুখারী সর্বশেষ হাদীস

৩২. তিরমিযী শরীফ, যিক্‌রের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং ৩৩৭২

যবানের মাধ্যমে দ্বীন শেখান

যদি এই যবানের মাধ্যমে আপনারা কাউকে দ্বীনের সামান্য কোন কথাও শেখান, উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি ভুলপন্থায় নামায পড়ছিল। আপনি বুঝতে পারলেন যে, ইনি ভুল পদ্ধতিতে নামায পড়ছেন। ফলশ্রুতিতে আপনি চুপে চুপে নির্জনে নরমভাবে মহব্বত ও স্নেহের সাথে তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ভাই! তোমার এ নামায ভুল ছিল। এভাবে নামায পড়। আপনার যবানের সামান্য হরকতে তার সংশোধন হয়ে গেল এবং তিনি সুন্নাত তরীকায় নামায পড়া আরম্ভ করে দিলেন। তো এখন সারাজীবন যত নামায তিনি সহীহ তরীকায় আদায় করবেন সেটার সাওয়াব আপনার আমলনামাতেও লেখা হবে।

সমবেদনামূলক কথা বলা

এক ব্যক্তি কষ্ট ও পেরেশানীতে ছিল। আপনি তার পেরেশানী দূর করার জন্য তাকে সমবেদনামূলক বা সান্ত্বনাসূচক কিছু কথাবার্তা বললেন। যদ্দরূন মানসিকভাবে তিনি উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন, তাহলে আপনার এই সমবেদনামূলক কথাটা আপনার জন্য বিপুল সাওয়াবের উপলক্ষ হবে।

তাইতো এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِيَ بُرْدًا فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ "যদি কেউ সন্তানহারা মাকে সমবেদনা জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা ঐ সমবেদনা প্রকাশকারীকে জান্নাতে মূল্যবান জোড়া কাপড় পরিধান করাবেন।"[৩৩]

মোটকথা এ যবানকে ভালো কাজে ব্যবহারের যেসব পথ ও ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রেখেছেন সেগুলোর মধ্যে যবানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই দেখবেন আপনার আমলনামায়

৩৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১০৭৬

সাওয়াব ও নেকীর স্তূপ লেগে যাবে। উদাহরণস্বরূপ কোন দিকভ্রান্ত পথিক, আপনি তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে দিলেন। সামান্য একটু কাজ, হয়ত আপনি খেয়ালও করেননি যে, আপনি কোন নেকীর কাজ করেছেন কিন্তু এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ আপনাকে অসংখ্য নেকী ও সাওয়াব দান করবেন।

যাই হোক, যদি একজন মানুষ যবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তার জন্য জান্নাতের দরওয়াযাসমূহ খুলে যাবে এবং তার অগণিত গুনাহসমূহের ক্ষমার উপলক্ষ হবে। কিন্তু আল্লাহ না করুন যদি এই যবানের নাজায়িয ও ভুল ব্যবহার হয়, তাহলে এই যবানই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

যবান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন "যত মানুষ জাহান্নামে যাবে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ হল ঐসব মানুষ যারা যবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি।"[৩৪] উদাহরণস্বরূপ মিথ্যা কথা বলল, গীবত বা পরনিন্দা করল, কারো মনে কষ্ট দিল। অন্যদের সাথে গীবতে অংশগ্রহণ করল। কারো কষ্টের উপর আনন্দ প্রকাশ করল ইত্যাদি। এ সমস্ত গুনাহের কাজের দরূন তাকে মুখ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

অর্থাৎ "বহু সংখ্যক মানুষকে তাদের যবানের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ মুখ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৩৫]

এজন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ আযীমুশ শান নেয়ামত যবানকে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং সহীহ কাজে ব্যবহার করতে হবে।

---

৩৪. সুনানে তিরমিযী

৩৫. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬

এজন্যই অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ خَيْرًا وَإِلاَّ فَاصْمُتْ

অর্থাৎ যবান দ্বারা হয়ত ভালো কথা বল নতুবা চুপ থাক।

কেননা যবানের ভুল ব্যবহারের তুলনায় নীরব থাকা হাজার গুণ বেশি উত্তম।[৩৬]

প্রথমে ওজন করো অতঃপর বলো

এজন্যই বেশি কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মানুষ বেশি কথা বললে তার যবান নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কিছু না কিছু গড়বড় অবশ্যই করবে। ফলশ্রুতিতে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হবে। এজন্য প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলবেন, অতিরিক্ত বলবেন না। যেমন জনৈক বুযুর্গ বলেছেন: প্রথমে কথাটাকে মাপতে হবে অতঃপর বলতে হবে। এভাবে হিসাব করে কথা বললে যবান নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ.

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী ছাহেব রহ. এর একজন উস্তায ছিলেন হযরত মিঞাঁ সায়্যিদ আসগার হুসাইন ছাহেব রহ.। অনেক উঁচু স্তরের বযুর্গ ছিলেন। "হযরত মিঞাঁ ছাহেব" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি এমন একজন বুযুর্গ ছিলেন যিনি সাহাবায়ে কিরামের স্মরণকে তাজা করে দিয়েছেন। আমার আব্বাজানের তাঁর সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর খেদমতে খুব বেশি বেশি যাতায়াত করতেন। হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. আমার আব্বাজানকে খুব স্নেহ করতেন।

আমার আব্বাজান রহ. বলেন: একবার আমি হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং গিয়ে বসে পড়লাম। তখন হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. বলতে লাগলেন: দেখ ভাই মৌলভী মুহাম্মাদ

---

৩৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৫

শফী! আজকে আমরা পরস্পরে আরবীতে কথা বলব। উর্দূতে কথা বলব না।

আমার মরহুম আব্বাজান বলেন: আমি খুব অবাক হলাম। ইতোপূর্বে এমনটি কখনো হয়নি। আজ বসে বসে আরবীতে কথা বলার এ খেয়াল কিভাবে আসল? আমি জিজ্ঞেস করলাম হযরত! কী ব্যাপার। হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. বললেন: না, এমনিতেই। মনে হল যে, আজ আরবীতে কথা বলব। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বললেন: আসল কথা হল আমি লক্ষ্য করলাম যখন আমি আর তুমি একসাথে বসি, তখন কথাবার্তা অনেক বেশি হয়ে যায়। এদিক সেদিকের কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে যায়। যদ্দরূন অনেক সময় আমরা অনর্থক কথা বার্তাতেও লিপ্ত হয়ে পড়ি। আমার খেয়াল হল যদি আমরা আরবীতে কথাবার্তা বলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি তো আরবী যেহেতু না তুমি সাবলীলভাবে বলতে পার, আর না আমি সাবলীল বলতে পারি, ফলশ্রুতিতে কিছুটা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে আরবী বলতে হবে। যদ্দরূন এই যবান যেটা লাগামহীন চলতে থাকে, নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। তখন আর অনর্থক কথাবার্তা হবে না। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাবার্তাই হবে।

আমাদের উদাহরণ

অতঃপর হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. বলেন: ভাই! আমাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির মত যে তার বাসা হতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা ও টাকা-পয়সা নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল এবং এখনো তার সফর অব্যাহত ছিল। এখনো সে মান্‌যিল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি অথচ তার সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং টাকা-পয়সা খরচ হয়ে গেছে। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি মুদ্রা রয়ে গেছে। এখন সে খুব সাবধানে এ মুদ্রাগুলো খরচ করছে। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত খরচ করছে না। যাতে করে সে কোনক্রমে স্বীয় মানযিলে পৌঁছতে পারে।

অতঃপর হযরত বলেন: আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় পার করে এসেছি। আর জীবনের যে মুহূর্তগুলো আল্লাহ তাআলা দান

করেছিলেন সেগুলো মানযিল পর্যন্ত পৌঁছার জন্য মাল-দৌলত ও স্বর্ণমুদ্রা ছিল। এগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে মানযিল পর্যন্ত পৌঁছা সহজ হয়ে যেত। কিন্তু আমার জানা নাই কোন্ কোন্ খাতে এটাকে খরচ করে ফেলেছি। বসে বসে গল্পগুজব করছি। আড্ডার মজলিসে অংশগ্রহণ করছি। যদ্দরুন সমস্ত শক্তি ঐ ফালতু কাজে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এখন তো জানাও নেই যিন্দেগীর আর কয়দিন অবশিষ্ট আছে? এখন মনে চায় জীবনের এই অবশিষ্ট সময়গুলো খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে।

মহান আল্লাহ যাদেরকে এ ফিকির দান করেন, তাঁদের অবস্থা এমনই হয়ে যায়। তাঁরা চিন্তা করেন যেহেতু মহান আল্লাহ যবানের এ দৌলত দান করেছেন, সেহেতু খুব সাবধানে এটাকে ব্যবহার করতে হবে। ভুল স্থানে ব্যবহার করা যাবে না।

যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চিকিৎসা

হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযি. যিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি একবার স্বীয় যবান ধরে সেটা মোড়াচ্ছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি এমনটি কেন করছেন? উত্তরে তিনি বললেন: إِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এ যবান আমাকে বড় বড় বিপদে ফেলেছে।"[৩৭] এজন্য আমি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছি।

কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি নিজের মুখে ছোট নুড়ি পাথর দিয়ে বসে পড়লেন। যাতে করে বিনা প্রয়োজনে মুখ থেকে কোন কথা বের না হয়।

যাই হোক, যবান এমন এক জিনিস যার মাধ্যমে মানুষ জান্নাতও উপার্জন করতে পারে আবার জাহান্নামও উপার্জন করতে পারে। এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরী। যাতে করে এটা অপ্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহৃত না হয়। এটার পদ্ধতি এটাই যে, মানুষ অধিক কথা বলা হতে

৩৭. মুআত্তা ইমাম মালেক

সতর্ক থাকবে। কেননা মানুষ যতবেশি কথা বলবে, ততবেশি গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

এজন্যই ইসলাহ বা সংশোধন প্রত্যাশী ব্যক্তিগণ যখন কোন শাইখের নিকট চিকিৎসার জন্য যান, তখন শাইখ প্রত্যেকের দিলের হালত অনুযায়ী তার জন্য সমীচীন পৃথক ব্যবস্থাপত্র বাতলে দেন। আবার তাঁরা অনেকের জন্য স্রেফ যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চিকিৎসা বলে দেন।

যবানে তালা দিয়ে দিন

আমার মুহতারাম আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর খেদমতে এক ব্যক্তি আসতেন। কিন্তু তিনি আব্বার সাথে কোন ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেননি। ব্যস, শুধুমাত্র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতেন। আর যখন কথা আরম্ভ করতেন, তখন আর থামার নাম নিতেন না। একটা কাহিনী শোনালেন। সেটা শেষ হওয়া মাত্রই আরেকটা কাহিনী শুরু করতেন! আব্বাজান মরহুম এটা সহ্য করতে থাকতেন।

একদিন তিনি আব্বাজান রহ. এর নিকট দরখাস্ত করলেন যে, আমি আপনার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। আব্বাজান দরখাস্ত কবূল করলেন এবং অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন: হযরত! আমাকে কোন ওয়াযীফা বাতলে দিন, যা আমি পাঠ করব। আব্বাজান বললেন: তোমার ওয়াযীফা একটাই, আর সেটা হল তোমার যবানে তালা লাগাও অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণে রাখ। আর এই যে যবান সব সময় চলছে সেটাকে কণ্ট্রোল কর। তোমার আর অন্য কোন ওয়াযীফা নেই।

ফলশ্রুতিতে আল্লাহর পথের এ পথিক যখন যবানকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসলেন, তখন এর মাধ্যমেই তার ইসলাহ ও সংশোধন হয়ে গেছে।

গপশপে যবান ব্যবহার করা

বর্তমানে আমাদের সমাজে যবানের ভুল ব্যবহারের যে মহামারী চালু হয়েছে, মনে রাখবেন এটা মারাত্মক ধ্বংসাত্মক একটি জিনিস। বন্ধুরা ডেকে বলল যে, আসো কিছু গপশপ করি। এখন এই গপশপে ও আড্ডাবাজীতে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে, গীবত করা হচ্ছে, অন্যের কুৎসা রটানো হচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদ্দরুন আমাদের এক একটা মজলিস ও বৈঠক না জানি কত গুনাহের সমষ্টি হয়ে থাকে।

এজন্য সর্বপ্রথম কাজ হল এই যবানকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব অন্তরে সৃষ্টি করা। মহান আল্লাহ নিজ রহমতে এর গুরুত্ব আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

নারীজাতি ও যবানের ব্যবহার

এমনি তো পুরো সমাজই এই যবানের গুনাহে লিপ্ত। কিন্তু হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীজাতির যে সব আত্মিক ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোর মধ্যে এটাও একটা যে যবান তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নারীগণ! আমি জাহান্নামে সংখ্যার বিচারে তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি দেখেছি। অর্থাৎ পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি। মহিলারা জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? তো উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

অর্থাৎ "তোমরা অভিসম্পাত বেশি করো এবং স্বামীর নাশোকরী করো। এজন্য জাহান্নামে তোমাদের সংখ্যা বেশি।[৩৮]

---

৩৮. সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩০৪

দেখুন এ হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন উভয়টার সম্পর্ক যবানের সাথে। অধিক অভিশাপ এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা।

নারীরা যবানের ভুল ব্যবহার করে। হয়ত কাউকে গালী দিল বা বকা দিল বা গীবত করল, কারো চোগলখুরী করল ইত্যাদি। এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আমি জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ হযরত সাহল বিন সাদ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ বলেন: "যে ব্যক্তি আমার জন্য দুটি জিনিসের দায়িত্ব নিবে অর্থাৎ দুই চাপার মধ্যবর্তী জিনিস তথা মুখ এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী জিনিস অর্থাৎ লজ্জাস্থান, আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি।"[৩৯]

এর দ্বারা বুঝা গেল যবানের হেফাযত দ্বীনের হেফাযতের অর্ধেক। অর্ধ দ্বীন যবানের মধ্যে আর অর্ধেক গুনাহ যবানের মাধ্যমে হয়। এজন্য এর হেফাযত অত্যাবশ্যক।

নাজাতের জন্য তিনটি কাজ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ.

অর্থাৎ "হযরত উকবা বিন আমের রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তির কী উপায়? উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু

---

৩৯. সহীহ বুখারী, যবান হেফাযত অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪৭৪

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার যবানকে তোমার নিয়ন্ত্রণে রাখ এবং তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তোমার গুনাহের উপর ক্রন্দন করতে থাক।"[৪০]

তো এখানে তিনটি উপদেশের মধ্যে প্রথম উপদেশ হল যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

হে যবান! আল্লাহকে ভয় কর

عَنْ أَبِيْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، يَقُولُ اتَّقِ اللهَ فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ إِعْوَجَجْنَا.

অর্থাৎ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "সকালবেলা মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যবানকে লক্ষ্য করে বলে 'হে যবান! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা তো তোমারই অনুগত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব আর তুমি বেঁকে বসলে আমরাও বেঁকে বসব। উদ্দেশ্য হল মানুষের পুরো শরীর যবানের অনুগত হয়ে থাকে। যদি যবান ভুলকর্ম করে বসে তাহলে এর ফলে পুরো শরীর গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্য তারা যবানকে বলে তুমি ঠিক থেক। নতুবা তোমার কর্মকাণ্ডের কারণে আমরাও বিপদে পড়ে যাব"।[৪১]

এখন এই অঙ্গগুলো কিভাবে যবানকে সম্বোধন করে? হতে পারে যে, বাস্তবেই বলে। কেননা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা ঐসব অঙ্গগুলোর মধ্যে বলার যোগ্যতা দিয়ে দিবেন। ফলশ্রুতিতে তারা যবানের সাথে কথা বলবে। কেননা যবানের বলার শক্তি সেটাও তো আল্লাহরই দান। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এসব অঙ্গকে বলার যোগ্যতা দান করবেন।

---

৪০. সুনানে তিরমিযী, যুহদ অধ্যায়, হাদীস নং ২৪০৮

৪১. তিরমিযী শরীফ ২:৬৩

কেয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কথা বলবে

গত শতাব্দীতে "নেচারিয়্যাত" (প্রকৃতিবাদ) এর খুব জোরশোর ছিল। এই নেচারিয়্যাত ফেরকার লোকেরা মু'জিযাত বা অলৌকিক ঘটনাবলী ইত্যাদিকে অস্বীকার করে। তাদের বক্তব্য হল এসব প্রকৃতিবিরোধী জিনিস!

তাইতো এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. কে জিজ্ঞেস করেঃ কুরআনে কারীমে এই যে বলা হয়েছে কেয়ামতের দিন হাত পা সাক্ষ্য দিবে কথা বলবে তো এরা কিভাবে সাক্ষ্য দিবে? এদের মধ্যে তো যবান নেই। আর যবান ছাড়া কিভাবে বলবে? প্রতিউত্তরে হযরত থানভী রহ. বলেনঃ আচ্ছা তুমিই বল যবান যবানছাড়া কিভাবে কথা বলে? এই যবানও তো গোশতের একটি টুকরো। এর জন্য তো পৃথক কোন যবান নেই। কিন্তু তারপরও কথা বলছে। যখন আল্লাহ তাআলা গোশতের এই টুকরোয় বলার শক্তি দান করেছেন তখন সে বলতে শুরু করেছে। আল্লাহ তাআলা এই শক্তি ছিনিয়ে নিলে সে বলা বন্ধ করে দিবে। এই বলার শক্তিই আল্লাহ পাক হাত কে দান করলে সে বলতে থাকবে। পা কে দান করলে সে বলতে থাকবে।

যাই হোক এটা বাস্তবেও হতে পারে যে, সকালবেলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যবানের সাথে এভাবে কথা বলে। আবার এমনও হতে পারে যে, এটা স্রেফ একটা উদাহরণ মাত্র। যেহেতু সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যবানের অনুগত তাই যবানকে ঠিক রাখার চেষ্টা কর।

মোটকথা এই যবানের হেফাযত খুবই জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম না হবে এবং এটাকে গুনাহসমূহ হতে না বাঁচাবে, অতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সফলকাম হতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই যবানের হেফাযত এবং একে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

زبان کو صحیح استعمال کریں

যবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করুন

(২য় অধ্যায়)

বাদ হামদ ও সালাত

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۞

মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: হে মুমিনগণ! কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।[৪২]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয! গত কয়েক দিন ধরে সূরা হুজুরাতের তাফসীর বয়ান করা হচ্ছে। কেননা এ সূরা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিধি-বিধানে সুসমৃদ্ধ। আর আমাদের মধ্যে সামাজিক যেসব ব্যাধি দেখা যায়, ঐসব ব্যাধি দূর করার জন্য এ সূরায় যেসব দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ সূরায় একটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। যার বয়ান গত দুই জুমুআ থেকে চলছে।

দায়িত্বশীল মানুষের ভূমিকা পালন করুন

এ আয়াতে কারীমায় এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের ভূমিকা বড় দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, যা কানে পড়ল সেটার উপরই ভরসা করল আর সেটাকেই সামনে বয়ান করা আরম্ভ করে দিল। আর সেটার ভিত্তিতেই

---

৪২. সূরা হুজুরাত, আয়াত ৬

কারো বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণও আরম্ভ করে দিল। কিংবা সেটার ভিত্তিতে অন্তরে কুধারণা সৃষ্টি করে নিল। এই সব নাজায়িয। এগুলো কোন আদর্শ মুসলমানের স্বভাব হতে পারে না।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যাপারে পূর্ণ তাহকীক না হবে এবং এটা প্রমাণিত না হবে যে এ ঘটনা সত্য, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটার উপর আস্থা রাখা যাবে না। সে সংবাদ অন্য কাউকে বলাও যাবে না এবং সেটার ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করা যাবে না।

যবান অনেক বড় নেয়ামত

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই যে যবান দান করেছেন তা এত বড় নেয়ামত যে, আমরা যখন তখন যে কোন কথা নিজ যবানে উচ্চারণ করে আমাদের মনের অভিব্যক্তি অন্যের সামনে প্রকাশ করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা এমন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা বানিয়ে দিয়েছেন যে, এদিকে অন্তরে একটি খেয়াল আসল আর সেটাকে অন্য কারো নিকট পৌঁছানোর ইচ্ছা হল তো ওদিকে মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে যবান পর্যন্ত সমস্ত সরকারী মেশিনগুলোর মধ্যে নড়াচড়া আরম্ভ হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই আপনি ঐ কথাটি অন্যের কাছে পৌঁছে দিলেন।

যদি এমন বলা হত যে, তুমি অন্যের কাছে কোন কথা পৌঁছাতে চাইলে প্রথমে একটি সুইচ অন কর। এরপর নম্বর মিলিয়ে দেখ, অতঃপর অন্যের কাছে পৌঁছাও। যেমনটি টেলিফোনে করতে হয়। বলুন তখন কেমন মুসীবত হত যে, মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে একটি কথা অন্যের কাছে পৌঁছাতে চায় আর অপর ব্যক্তি তার সামনে বিদ্যমানও আছে, কিন্তু সে ঐ মুহূর্তেই সে কথা পৌঁছাতে পারছে না। বরং প্রথমে সুইচ অন করতে হবে এরপর নম্বর মিলাতে হবে। তারপর কথা পৌঁছাতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব কাজের কষ্ট দেননি বরং এদিকে অন্তরে একটি খেয়াল আসল আর ওদিকে আপনি যবান দ্বারা

সেটা আদায় করে দিলেন এবং অন্যকে আপনার খেয়াল বা মতামত শুনিয়ে দিলেন।

যবানের মূল্য কত? যবানহীন মানুষকে জিজ্ঞেস করুন

আমি আমার জীবনে এমন দুজন মানুষ দেখেছি যাদের গলার নল যেখান দিয়ে আওয়ায বের হয়, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যদ্দরূন তাদের যবান নড়াচড়া তো ঠিকই করত কিন্তু কোন আওয়ায বের হত না। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ডাক্তার সাহেব একটি যন্ত্র ঠিক করে দেন। এখন কথাবার্তা বলার সময় ঐ যন্ত্র গলায় লাগানো হত, তখন আওয়ায বের হত। কিন্তু সেই আওয়ায ছিল এমন যেমন কোন প্রাণী কথা বলছে। বাচ্চারা সেই আওয়ায শুনে হাঁসত।

আমি ঐ মানুষটার অস্থিরতা লক্ষ্য করতাম। কথা বলার প্রয়োজন হলে তিনি প্রথমে ঐ যন্ত্রটি তালাশ করতেন। এরপর সেটাকে লাগাতেন আর গলায় জোরে চাপ দিতেন, তবে গিয়ে অনেক কষ্টে আওয়ায বের হত। দেখে হতবাক হতাম মানুষ এমনও হয়! তাঁরও তো নিশ্চয়ই ইচ্ছা করত যে, আমি দ্রুত আমার আওয়ায অন্যের কাছে পৌঁছে দিব। কিন্তু তিনি সেটার উপর সক্ষম ছিলেন না।

মহান আল্লাহ আপন মেহেরবানী ও অনুগ্রহে যবানের এ নেয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন যে, এদিকে অন্তরে খেয়াল আসল আর ওদিকে কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দিল। মাঝখানে কোন বিরতি নেই।

সমস্ত মেশিন নড়াচড়া করছে

শিক্ষিত মানুষ জানেন যে, যখন মানুষ কথা বলতে চায় তখন প্রথমে অন্তরে ঐ কথার খেয়াল আসে, অতঃপর সে খেয়াল মস্তিষ্কে যায়। এরপর মস্তিষ্কের পক্ষ থেকে যবানের জন্য নির্দেশ জারী হয়। তারপর যবান কথা বলে।

দেখুন! একদিকে অন্তর চিন্তা করছে, আরেকদিকে মস্তিষ্ক হুকুম জারী করছে। আর অপরদিকে যবান যে নড়াচড়া করছে। তারপর গলার পূর্ণ ব্যবস্থাপনা কাজ করছে। যদ্দরূন বাইরে আওয়ায বের হচ্ছে।

এসব মেশিন শুধুমাত্র এজন্য নড়াচড়া করছে যাতে আমরা আমাদের কথা অন্যদের নিকট পৌঁছাতে পারি। এটা মহান আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। যেটা আল্লাহ তাআলা চাওয়া ছাড়াই বিনামূল্যে আমাদেরকে দান করেছেন।

চিন্তা-ভাবনা করে যবানকে ব্যবহার করুন

আমাদের কাছে মহান আল্লাহর শুধুমাত্র একটি দাবী আর সেটা হল এই যে, যে সব সরকারী মেশিন তোমাদেরকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে, ছেলেবেলা থেকে নিয়ে বার্ধক্য পর্যন্ত বরং মৃত্যু পর্যন্ত এসব মেশিন কাজ করছে। এই মেশিনকে কখনো ওয়ার্কশপে পাঠাতে হয় না। সার্ভিস করাতে হয় না, ওয়েল্ডিং করাতে হয় না, মেরামত লাগে না। সব সময় এগুলো আমাদের সাথে আছে। আমার শুধু তোমাদের কাছে একটাই দাবী সেটা হল এই যে, যখন তুমি এ যবানকে ব্যবহার করবে, তখন চিন্তা-ভাবনা করে করবে যে, এর দ্বারা কী কথা বের হচ্ছে? এমন যেন না হয় যে, যবান সারাদিন কাঁচির মত চলতে থাকে। মুখে যা আসছে তাই বলছে। এটা লক্ষ্য করছে না যে, এ কথার দ্বারা ফায়েদা বা উপকার হবে নাকি লোকসান বা ক্ষতি হবে। আমি কি সঠিক কথা বলছি নাকি বেঠিক কথা বলছি। এ কথাটা বললে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন নাকি অসন্তুষ্ট? এই সরকারী মেশিন দ্বারা ফায়েদা উঠাও কিন্তু একটু চিন্তা-ভাবনা করে ফায়েদা উঠাও।

প্রতিটি কথা রেকর্ড হচ্ছে

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

অর্থাৎ "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে; যে লেখার জন্য সদা প্রস্তুত।"[৪৩]

---

৪৩. সূরা কাফ, আয়াত ১৮

বর্তমান যুগের পূর্বে “রেকর্ড” কী জিনিস তা বুঝা মানুষের জন্য অনেক মুশকিল ছিল যে, এক একটা শব্দ-কথা, বাক্য কিভাবে রেকর্ড করা হয়? কিন্তু বর্তমানে টেপ রেকর্ডার এবং অন্যান্য নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি এটা বুঝা কে সহজ করে দিয়েছে। এখন অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে কথাটাই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় সেটাই রেকর্ড হয়ে যায়। চাই সেটা ভালো কথা হোক বা মন্দ কথা। জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কথা রেকর্ড করার সিস্টেম মহান আল্লাহর কাছে আছে। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট যাওয়ার পর সেই রেকর্ডিং শুনিয়ে দেয়া হবে যে, তুমি অমুক সময় অমুক কথা বলেছ, আজকে প্রমাণ পেশ কর তুমি যে কথাটা বলেছিলে তা সঠিক ছিল না ভুল।

তখন কেন সতর্ক হয়ে কথা বলেন?

যদি কয়েকজন মিলে আড্ডা দেয়ার সময় জানতে পারে যে, সি আইডির পক্ষ থেকে এখানে একটি টেপ রেকর্ডার লাগানো আছে। যে ব্যক্তিই কথা বলবে সেটাই রেকর্ড হয়ে যাবে।

বলুন তো তখনও কি আপনি এমন স্বাধীন ভাবে কথা বলেন? যেমনটি এখন বলছেন। নাকি তখনও নির্দ্বিধায় মুখে যা আসে তাই বলবেন? না না। এমনটি নিশ্চয়ই করবেন না। কেননা আপনার খুব ভালোভাবে জানা আছে যে, এখানে সি আইডি টেপ রেকর্ডার লাগিয়ে রেখেছে। এবং প্রতিটি কথা রেকর্ড হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কোন উল্টাপাল্টা কথা যদি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছে যায়, তাহলে আমি গ্রেফতার হয়ে যাব। এজন্য ঐ মজলিসে সবাই সতর্ক হয়ে কথা বলবে।

দায়িত্বশীল হওয়ার চিন্তা করুন

আল্লাহ তাআলা তো চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এ ঘোষণা করে রেখেছেন যে, তোমাদের এক একটি কথা আল্লাহ পাকের কাছে রেকর্ড হচ্ছে। এজন্য যখনই কথা বলবা চিন্তাভাবনা করে কথা বলবা যে, সঠিক কথা বলছ নাকি বেঠিক কথা। এটা গুজব নয় তো? দায়িত্বহীন

ব্যক্তির ন্যায় কোন কথা বলবে না। মানুষের নামে মিথ্যা অপবাদ, গীবত, কারো মনে আঘাত দেয়া ইত্যাদি এসব করা যাবে না। মহান আল্লাহর কাছে প্রতিটি কথার উত্তর দিতে হবে।

এমন মনে না করা যে, কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে বাতাসে উড়ে গেছে, খতম হয়ে গেছে। কোন কথা খতম হয়না। বরং প্রত্যেকটি কথা মহান আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

এজন্য কুরআনে কারীম যা আমাদের জন্য হেদায়াতের পয়গাম ও বার্তা, আমাদেরকে দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করছে। এমনটি যেন না হয় যে, যা শুনলাম তাই প্রচার করা আরম্ভ করলাম।

মিথ্যার নিকৃষ্টতম আরোহী

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

بِئْسَ مَطِيَّةُ الْكِذْبِ زَعَمُوْا

অর্থাৎ "মিথ্যার নিকৃষ্টতম আরোহী হল ঐ ব্যক্তি যে বলে বেড়ায় যে, লোকেরা এমনটি বলে।"[৪৪]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আমাদের জীবন কুরবান হোক, তিনি পবিত্র হাদীসসমূহের মাধ্যমে এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতার উপলক্ষ আছে। মানুষের মানসিক অবস্থার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি জ্ঞানী আর কে আছেন?

যাই হোক, মানুষ মনে করে যে উল্লেখিত হাদীসটি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অতি সংক্ষিপ্ত একটি কথা। অথচ এর মধ্যে মানুষের এক বিশাল দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটা

৪৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৭২

হচ্ছে এই যে সমাজের কিছু মানুষ আছে এমন, যাদের মিথ্যা কথা বলতে বিবেক একটুও বাঁধে না। এরা যে জঘন্য প্রকারের অপরাধী সেটা তো বলাই বাহুল্য।

আবার কিছু মানুষ আছে এমন, যারা চিন্তা করে যে, আমি যেন সমাজের সামনে মিথ্যুক প্রমাণিত না হই। মানুষ যেন আমাকে মিথ্যুক না বলে, মিথ্যুক প্রমাণিত হলে অনেক লজ্জা ও শরম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরা মিথ্যা বলার জন্য একটি কৌশল বের করেছে। সেই কৌশল হচ্ছে এই যে, আমরা সরাসরি মিথ্যা বলার পরিবর্তে এভাবে বলব যে, লোকেরা এমনটি বলে, মানুষের খেয়াল এমন যে, অমুক ব্যক্তি এত টাকা আত্মসাৎ করেছে।

বাহ্যত এ কথাটা যে বলছে, সে নিজের মাথা থেকে দায়িত্ব নামিয়ে ফেলছে আর মানুষের উপর দিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষ এমনটি বলে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হল মানুষের কাঁধে এ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে এ কথাটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

এখন দুই অবস্থা। হয় তুমি মানুষদেরকে মিথ্যুক মনে কর অথবা সত্যবাদী মনে কর। যদি মানুষদেরকে মিথ্যুকই মনে কর তবে তাদের কথার প্রচার-প্রসারের কষ্ট কেন সহ্য করছ? আর যদি সত্যবাদী মনে কর তাহলে বল তোমার কাছে এর কোন প্রমাণ আছে কি নেই? যদি তোমার কাছে কোন প্রমাণ না থাকে, আর তুমি এটাকে পুরোপুরি সত্য মনেও কর না, তাহলে যেমনিভাবে সরাসরি এ কথাটা সামনে নকল করা অপরাধ ও গুনাহ এবং মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত, ঠিক তেমনিভাবে যদি মানুষের মাথার উপর রেখে এ কথাটা বর্ণনা কর, তাহলে সেটাও বাস্তবিক পক্ষে অন্যায় ও পাপ হবে।

এজন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মিথ্যার নিকৃষ্টতর আরোহী একথা বলে যে, লোকেরা এটা বলে"!!

পরস্পরে লড়াই ঝগড়া কেন জন্ম নিচ্ছে?

এসব কথা মনে রেখে নিজের আশেপাশে একটু নজর বুলিয়ে দেখুন আজ আমাদের সমাজে কী হচ্ছে? কিভাবে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, কিভাবে ভিত্তিহীন কথার উপর আস্থা রেখে সেটাকে প্রচার করা হচ্ছে? আর কিভাবে ফালতু কথা বিশ্বাস করে অন্তরে কুধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে?

অথচ এ সূরা হুজুরাতেই আছে: কুধারণা অন্তরে পোষণ করাও গুনাহ। (আয়াত নং ১২)

বর্তমানে আমাদের সমাজে এসব অপকর্ম দেদারসে চলছে। এ জিনিসগুলোই সমাজকে অস্থির করে রাখছে। দূষিত করে ফেলছে। হিংসা, দুশমনী ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে।

এসব কিছুর মূল কারণ হল, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐসব শিক্ষার উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছি।

সমস্ত ঝগড়া খতম হয়ে যাবে

যদি আজ আমরা কুরআনে কারীমের এসব হিদায়াত ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমলের জন্য পাক্কা নিয়্যত করে ফেলি এবং দো জাহানের সরদার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীন-শরীয়ত ও সুন্নাহ অনুযায়ী পুরোপুরি চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তাহলে কত ঝগড়া-বিবাদ মারামারি ও হানাহানি যে বন্ধ হয়ে যাবে তার ইয়ত্তা নেই।

সমস্ত বিবাদের মূল হল ভিত্তিহীন কথাসমূহের উপর ভিত্তিস্থাপন করে বসে থাকা ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মহান আল্লাহ আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে সব নির্দেশনা বুঝার এবং তদনুযায়ী আমল করারও তাউফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

غیبت : زبان کا ایک عظیم گناہ

গীবতঃ যবানের একটি ভয়াবহ গুনাহ

(৩য় অধ্যায়)

বাদ হামদ ও সালাত।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

"গীবত" একটি ভয়াবহ গুনাহ

ইমাম নববী রহ. গুনাহসমূহের আলোচনায় সর্বপ্রথম ঐ গুনাহের আলোচনা করেছেন যা আমাদের যবান বা মুখ দ্বারা প্রকাশ পায় আর এর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ঐ গুনাহের কথা আলোচনা করেছেন যার রেওয়াজ আমাদের সমাজে সব থেকে বেশি অর্থাৎ গীবতের গুনাহ।

এটা এমন একটা বিপদ যা আমাদের মজলিস ও সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে। কোন মজলিস এর থেকে মুক্ত নয়। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে প্রচন্ড শক্ত ধমক দিয়েছেন।

আর কুরআনে কারীমে তো গীবতের ব্যাপারে এমন কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা সম্ভবত অন্য কোন গুনাহের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তাইতো ইরশাদ হচ্ছে :

وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

অর্থাৎ "এবং তোমাদের একে যেন অন্যের গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।"[৪৫]

---

৪৫. সূরা হুজুরাত, আয়াত ১২

“গীবত” এর সংজ্ঞা

গীবতের অর্থ কি? গীবতের অর্থ হল অন্যের অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা করা। চাই সে দোষটা সঠিক হোক অর্থাৎ আসলেই তার মধ্যে আছে অথবা বেঠিক অর্থাৎ তার মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে ঐ দোষটা নাই। এতদসত্ত্বেও সেটার আলোচনা করলে সেটা গীবত হবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, জনৈক সাহাবী প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কি? উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ অর্থাৎ তোমার (দ্বীনী) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার আলোচনা করা যেটাকে সে পছন্দ করে না। অর্থাৎ যদি সে জানতে পারে যে, মজলিসে এভাবে আমার আলোচনা হয়েছে, তবে সে কষ্ট পাবে। এবং এটাকে খারাপ মনে করবে। এটাই গীবত।

ঐ সাহাবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ অর্থাৎ যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই খারাবীটা বাস্তবেই থাকে, যেটার আমি আলোচনা করছি, তবুও কি গীবত হবে? উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْكَ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِلاَّ فَقَدْ بَهَتَّهُ

অর্থাৎ যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষেই ঐ দোষটা থাকে, তাহলে তো তুমি তার গীবত করলে। আর যদি ঐ দোষটা তার মধ্যে না থাকে তবে তো তুমি তার উপর অপবাদ আরোপ করলে। সেক্ষেত্রে তোমার দ্বিগুণ গুনাহ হবে।[৪৬]

এবার আমাদের মাহফিল ও মজলিসগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন কী পরিমাণ দোষচর্চা হয়। দিন রাত আমরা এ গুনাহে লিপ্ত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

অনেকে এটাকে বৈধ বানানোর জন্য এভাবে বলে যে, আমি গীবত করছি না। আমি তো তার মুখের উপর একথা বলতে পারি! উদ্দেশ্য

---

৪৬. সুনানে আবূ দাউদ, গীবত অধ্যায়, হাদীস নং ৪৮৭৪

হল যখন মুখের উপর এ কথা বলতে পারি, তখন আমার জন্য এই গীবত জায়িয!

মনে রাখবেন, চাই আপনি সে কথা তার মুখের উপর বলতে পারুন বা না পারুন, সর্বাবস্থাতেই সেটা গীবত। ব্যস যে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা করাই গীবত এবং এটা কবীরা গুনাহ।

"গীবত" কবীরা গুনাহ

আর এই গীবত এমনই কবীরা গুনাহ যেমন মদপান করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। উভয়টার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেগুলোও অকাট্য হারাম আর এটাও অকাট্য হারাম। বরং গীবতের গুনাহ এ হিসেবে ঐসব গুনাহ হতে বেশি মারাত্মক যে, গীবতের সম্পর্ক হল বান্দার হুকূকের সাথে। আর হুকূকুল ইবাদের ব্যাপার হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মাফ না করবে, অতক্ষণ পর্যন্ত ঐ গুনাহ মাফ হয় না। অন্যান্য গুনাহ শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হতে পারে। কিন্তু এই গুনাহ শুধুমাত্র তাওবার দ্বারাও মাফ হবে না। এর দ্বারাই এ গুনাহটির ভয়াবহতার অনুমান করা যায়।

এজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে পাক্কা নিয়্যত করুন যে, আজ থেকে কারো গীবত করব না ও কারো গীবত শুনব না। আর যে মজলিসে গীবত হচ্ছে সেখানে কথাবার্তার গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলতে হবে। আলোচনার গতিপথ পরিবর্তন করতে না পারলে ঐ মজলিস থেকে উঠে চলে যাবে। কেননা গীবত করাও হারাম। শোনাও হারাম।

এরা নিজেদের চেহারা নখ দ্বারা আচড়াবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ.

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাস খাদেম ছিলেন। টানা দশ বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "মিরাজের রাতে যখন আমাকে উপরে উঠিয়ে নেয়া হল, তখন সেখানে আমি এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যারা স্বীয় নখ দিয়ে চেহারা ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি হযরত জিব্রীল আ. কে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, এরা হল ঐ সমস্ত মানুষ যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করে এবং মানুষের ইজ্জত-আব্রুর উপর হামলা করে।"[৪৭]

গীবত ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য গুনাহ

যেহেতু এই গুনাহটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর সামনে বর্ণনা করেছেন, এজন্য এ সবগুলোকে সামনে রাখতে হবে। যাতে করে আমাদের অন্তরে সেটার খারাবী বদ্ধমূল হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে এর ভয়াবহতা আমাদের অন্তরে বসিয়ে দিন এবং এর অনিষ্টতা হতে বেঁচে থাকার তাউফীক দান করুন। আমীন।

এ হাদীসে পাকে আপনি লক্ষ্য করলেন যে, পরকালে গীবতকারীদের পরিণতি হবে স্বীয় নখ দ্বারা নিজ নিজ চেহারা ক্ষত-বিক্ষত করা। অন্য একটি বর্ণনায় যেটা সূত্রগতভাবে অতটা শক্তিশালী নয় কিন্তু অর্থগত ভাবে সহীহ। সেটা হল এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

অর্থাৎ "গীবত ব্যভিচারের চোয়েও মারাত্মক গুনাহ।"[৪৮]

---

৪৭. সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৮৭৮

৪৮. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, গীবত অধ্যায়, খণ্ড ৮, পৃ: ৯১

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, আল্লাহ না করুক যদি কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, পরবর্তীতে যখন তার মধ্যে অনুতাপ ও অনুশোচনা আসবে, তখন সে তাওবা করে নিবে। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলাও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। পক্ষান্তরে গীবতের গুনাহ অতক্ষণ পর্যন্ত মাফ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করা হয়েছে উনি মাফ না করেন।

গীবতকারীকে জান্নাতে প্রবেশ থেকে আটকে দেয়া হবে

একটি হাদীসের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যারা গীবত করে, তারা দুনিয়াতে যত ভালো কাজই করুক, যেমন হয়ত প্রচুর নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, ইবাদত করেছে, কিন্তু যখন তারা পুলসিরাত পার হবে যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি সেতু, তখন তাদেরকে আটকে দেয়া হবে। অবশ্য যাঁরা জান্নাতী, তাঁরা সেই পুল পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যাদের জন্য জাহান্নামের ফয়সালা হবে তারা এ পুল অতিক্রম করতে পারবে না। তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।

তো গীবতকারীকেও পুল পার হতে দেয়া হবে না, আটকে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা অতক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ গীবতের কাফফারা আদায় না করবে। অর্থাৎ যার গীবত করেছ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করবে এবং সে তোমাকে ক্ষমা না করবে অতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

নিকৃষ্টতম সুদ হল গীবত

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যন্ত বলেছেন যে, সুদ এমন জঘন্য একটি গুনাহ, যার মধ্যে অসংখ্য খারাবী আছে আর এর সর্বনিকৃষ্ট পর্যায় হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করা, নাউযুবিল্লাহ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৭৪)

সুদের ব্যাপারে এমন কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যা অন্য কোন গুনাহের ব্যাপারে আসেনি। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিকৃষ্টতম সুদ হল নিজ মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের উপর হামলা করা অর্থাৎ গীবত করা। কত মারাত্মক ধমকী।[৪৯]

গীবত, মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া

একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে দুজন নারী রোযা রেখে পরস্পরে গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, দুজন নারী রোযা রেখেছিলেন কিন্তু তাদের অবস্থা শোচনীয়। তৃষ্ণায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারা এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত ওহীর মাধ্যমে জেনে থাকবেন যে, ঐ দুজন নারী গীবত করেছিল। ফলশ্রুতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস। যখন তাদেরকে নিয়ে আসা হল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, তাদের অবস্থা বাস্তবেই অত্যন্ত ভয়াবহ। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন একটি বড় পেয়ালা আনার জন্য। পেয়ালা আনা হলে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল বমি করার জন্য। ফলে তারা উভয়েই বমি করল। ভিতর হতে রক্ত, পূজ আর গোশতের টুকরো বের হল এমনকি ঐ পেয়ালা ভরে গেল।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এই হল তোমাদের ঐসব ভাই-বোনের রক্ত, পূজ ও গোশত যা তোমরা দুজন রোযা অবস্থায় খেয়েছিলে।

তোমরা উভয়ে রোযা রেখে বৈধ খানাতো পরিহার করেছ কিন্তু যে খানা হারাম ছিল অর্থাৎ অন্য মুসলমানের রক্ত ও গোশত খাওয়া

৪৯. সুনানে আবূ দাউদ, গীবত অধ্যায়, হাদীস নং ৪৮৭৬

সেটা তোমরা পরিহার করতে পারনি। যদ্দরূন তোমাদের পেটে এ দুটো বস্তু ভরে গেছে। যে কারণে তোমাদের এ অবস্থা হয়েছে।

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীতে কখনো আর গীবতে লিপ্ত হবে না। কেমন যেন আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রে গীবতের উদাহরণ দৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গীবতের পরিণতি এমনই হয়। (ফাযায়েলে রামাযান, পৃ ৪৪)

আসল কথা হল আমাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের অনুভবশক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে। যে কারণে গুনাহের খারাবী ও অনিষ্টতা আমাদের অন্তর হতে বের হয়ে গেছে। কিন্তু যাঁদেরকে মহান আল্লাহ সুস্থ অভিরুচি দান করেন, তাঁদেরকে এটার চাক্ষুষ অবস্থাও দেখিয়ে দেন।

গীবত ও ভয়ংকর একটি স্বপ্ন

রিবয়ী নামক একজন তাবেয়ী নিজ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: একবার আমি একটি মজলিসে পৌঁছলাম। আমি দেখলাম যে, লোকজন বসে বসে কথাবার্তা বলছে। আমিও ঐ মজলিসে বসে গেলাম। এখন কথা বলার সময় কারো গীবত শুরু হয়ে গেল।

মজলিসে বসে কারো গীবত করাটা আমার নিকট অপসন্দনীয় মনে হল। ফলে আমি ঐ মজলিস ছেড়ে উঠে চলে গেলাম। কেননা কোন মজলিসে গীবত হলে বাধা দিতে হবে। বাধা দেয়ার সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে কথাবার্তায় শরীক হবে না। বরং উঠে চলে যাবে। ফলশ্রুতিতে আমি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর মনে হল যে, এখন হয়ত এই মজলিসে গীবত বিষয়ক কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে, এজন্য আমি দ্বিতীয়বার ঐ মজলিসে গিয়ে তাদের সাথে বসে পড়লাম। এবারো কিছুক্ষণ এদিক সেদিকের কথাবার্তা চলল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় গীবত শুরু হয়ে গেল। এবার আমার হিম্মত দুর্বল হয়ে গেল। আমি ঐ মজলিস থেকে উঠতে পারলাম না। লোকেরা যে গীবত করছিল প্রথমে সেটা শুনছিলাম। অতঃপর আমি নিজেও দুই একটি গীবতের বাক্য বলে ফেলি।

যখন ঐ মজলিস থেকে উঠে বাসায় চলে আসলাম এবং রাত্রে ঘুমালাম তখন স্বপ্নে অত্যন্ত কুৎসিত কালো চেহারার একজন মানুষকে দেখলাম। যে বড় একটি পেয়ালায় আমার নিকট গোশত নিয়ে আসল। যখন আমি ভালভাবে দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, সেটা হল শূকরের গোশত। আর ঐ কালো চেহারার মানুষটি আমাকে বলছে, এই শূকরের গোশত। খাও। আমি বললাম: আমি তো মুসলমান। শূকরের গোশত আমি কিভাবে খাব? কিন্তু লোকটি বলল: না এই গোশত তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে। অতঃপর ঐ লোকটি জোর পূর্বক গোশতের সেই টুকরা আমার মুখে ঢুকানো শুরু করল। আমি যতই তাকে নিষেধ করি, ততই সে আমার মুখে ঠুঁসতে থাকে। এমনকি আমার বমি বমি ভাব ও বমি চলে আসার উপক্রম হল। কিন্তু সে তখনো ঠুঁসে যাচ্ছিল। এই প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে আমার চোখ খুলে গেল। জাগ্রত হওয়ার পর যখন আমি খাওয়ার সময় খানা খেলাম, তখন স্বপ্নের মধ্যে শূকরের গোশতের যে দুর্গন্ধযুক্ত স্বাদ ছিল, সেই স্বাদ আমি আমার খানায় অনুভব করলাম। আর ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমার অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই খানা খেতাম, তখনই ঐ শুকরের গোশতের চরম নষ্ট স্বাদ আমার খানার সাথে শামিল হয়ে যেত।

এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে এর উপর সাবধান করলেন যে, অল্প কিছুক্ষণ এই যে আমি গীবতে শরীক হয়েছি, এটার নষ্ট স্বাদ আমি ত্রিশ দিন পর্যন্ত অনুভব করেছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

হারাম খাওয়ার অন্ধকার

আসল কথা হল এই পরিবেশের খারাবীর ফলে আমাদের অনুভূতি খারাপ হয়ে গেছে। এজন্য গুনাহকে গুনাহ মনে হয় না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব নানূতভী রহ. বলতেন: আমি একবার কোন এক স্থানে খানার দাওয়াতে গিয়ে দু এক লোকমা খেয়ে ফেলেছিলাম। ঐ খানা কিছুটা সন্দেহজনক ছিল। হারাম হওয়ার

কিছুটা আশংকা ছিল। যদ্দরুন এক মাস পর্যন্ত আমার অন্তরে অন্ধকার অনুভব হচ্ছিল। বারবার কুচিন্তা মনের মধ্যে আসছিল। গুনাহের তাকাযা ও চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছিল।

গুনাহের একটা প্রতিক্রিয়া এটাও যে, এর কারণে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। গুনাহের আগ্রহ পয়দা হয়। ফলে মানুষ সেদিকে অগ্রসর হতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুভূতিকে সঠিক বানিয়ে দিন। আমীন।

যাই হোক, এ গীবত বড় মারাত্মক গুনাহ। যাকে মহান আল্লাহ সঠিক অনুভবশক্তি দান করেন তিনিই বুঝতে পারেন যে, আমি এটা কী করছি?

গীবতের অনুমতির ক্ষেত্রসমূহ

অবশ্য একটা কথা একটু বুঝে নিন। সেটা হল গীবতের সংজ্ঞা তো আমি আপনাদেরকে বলেছি যে, কারো অগোচরে এমনভাবে তার আলোচনা করা যেটা জানতে পারলে তার মনে কষ্ট হবে, চাই কথাটা সঠিকই হোক না কেন, এটা হল গীবত। কিন্তু শরীয়ত প্রত্যেক জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। মানুষের স্বভাবের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। মানুষের বৈধ প্রয়োজনসমূহের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। এজন্য কয়েকটা জিনিসকে গীবতের বাইরে রাখা হয়েছে। যদিও বাহ্যিকভাবে সেগুলোও গীবত। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয।

অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য গীবত করা

উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি এমন কাজ করছে যার দ্বারা অন্য মানুষের ক্ষতির আশংকা, এখন যদি অন্য মানুষদেরকে তার ব্যাপারে জানানো না হয়, তাহলে তারা ঐ লোকটার মাধ্যমে ক্ষতির শিকার হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যদি আপনি অন্য কাউকে বলে দেন যে, “অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সাবধান থাকবে”, তাহলে এমনটি করা জায়িয।

এটা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন। তিনি জরূরী প্রত্যেকটি কথা বলে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তাইতো হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একবার আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। আমাদের সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। লোকটা এখনো রাস্তার মধ্যেই ছিল, ইত্যবসরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকটির প্রতি ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন:

بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ

অর্থাৎ "এ লোকটি স্বীয় গোত্রের সবচেয়ে খারাপ মানুষ।"

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি এ কথা শুনে নিজেকে একটু সামলে বসলাম। যেহেতু সে খারাপ মানুষ। কিছুটা হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

যখন ঐ লোকটা মজলিসে এসে বসে গেল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র অভ্যাস অনুযায়ী নরম ভাষায় কথা বললেন। পরবর্তীতে লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বললেন যে লোকটি মন্দ, কিন্তু যখন লোকটি আপনার কাছে এসে বসল তখন তো আপনি তার সাথে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে নরম সুরে কথা বললেন। ব্যাপারটা কেমন হল?

উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সব থেকে নিকৃষ্ট লোক হল সেই লোক, যার অনিষ্টতার আশংকায় মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ তার মন মানসিকতাই খারাপ। তার সাথে নরম ব্যবহার করা না হলে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী তার সাথে নম্রতাপূর্ণ আচরণ করেছি।"[৫০]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে, এ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.

---

৫০. সুনানে তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ১৯৯৬

কে এই যে বললেন যে "লোকটা খারাপ মানুষ"। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো মনে হচ্ছে এটা গীবত। যেহেতু লোকটির অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ গীবত এজন্য জায়িয হয়েছে যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়েশা রাযি. কে সতর্ক করে দেয়া, যাতে তিনি ভবিষ্যতে তার ফাসাদের শিকার না হন।

এজন্য কারো অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য তার অনুপস্থিতিতে যদি তার খারাবী বর্ণনা করা হয়, তবে সেটা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং এমনটি করা জায়িয।

যদি অন্যের প্রাণহানির আশংকা হয়

বরং কোন কোন অবস্থায় দোষ বলে দেয়া ওয়াজিব। উদাহরণস্বরূপ একজনকে দেখলেন যে, সে অন্যের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তো এমতাবস্থায় ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এটা বলে দেয়া জরুরী যে, তোমার প্রাণ আশংকার মধ্যে আছে। যাতে করে সে নিজেকে হেফাযত করতে পারে। এজন্য এ জাতীয় ক্ষেত্রে গীবত জায়িয।

প্রকাশ্য গুনাহকারীর গীবত

একটি হাদীস আছে। যার সঠিক মর্ম লোকেরা বুঝে না। সেটা হল এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا غِيْبَةَ لِفَاسِقٍ وَلَا مُجَاهِرٍ

অর্থাৎ "ফাসেক ও প্রকাশ্য গুনাহকারীর গীবত গীবত নয়"।[৫১]

এ হাদীসের মর্ম কেউ কেউ এমনটি মনে করেন যে, যদি কেউ কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে, তাহলে তার যত ইচ্ছা গীবত করতে থাকো, সেটা জায়িয। অথবা যে ব্যক্তি বিদআতে লিপ্ত, তার গীবত জায়িয! অথচ হাদীসটির প্রকৃত মর্ম এরূপ নয়। বরং এর মর্ম হল যে ব্যক্তি

৫১. জামিউল উসূল ৮: ৪৫০

প্রকাশ্য ফাসেকী কাজে লিপ্ত, উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে মদপান করে এখন যদি কেউ তার অগোচরে একথা বলে যে, লোকটি তো মদ্যপানে অভ্যস্ত, তাহলে এটা গীবত হবে না। কেননা সে তো নিজেই ঘোষণা করছে যে, আমি মদ পান করি। এখন তার অনুপস্থিতিতে তার মদপান বিষয়ক আলোচনা হলে তার মনে কষ্ট লাগবে না। কেননা সে তো প্রকাশ্যেই মানুষের সামনে পান করে। এজন্য এটা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত

কিন্তু যে কাজটা সে অন্যদের সামনে প্রকাশ করতে চায় না, যদি সেটার আলোচনা আপনাদের সামনে করা হয়, তাহলে কিন্তু সেটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। উদাহরণস্বরূপ লোকটি প্রকাশ্যে মদ তো পান করে, সুদ তো খায় কিন্তু তার এমন কোন গুনাহ আছে যেটাকে সে লুকিয়ে লুকিয়ে করে। মানুষের সামনে সেটা প্রকাশ করতে চায়না। আর সে গুনাহটাও এমন যে, সেটার ক্ষতি অন্য কোন মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে না। তাহলে এমতাবস্থায় তার গীবত করা এবং ঐ বিশেষ গুনাহের আলোচনা করা জায়িয নেই। এজন্য ঐ ব্যক্তি প্রকাশ্যে যে ফাসেকী বা গুনাহের কাজ করছে, সেটার আলোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এমনটি না হলে সেটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এই হল "ফাসেকের গীবত গীবত নয়" কথাটার প্রকৃত ব্যাখ্যা।

ফাসেক ও ফাজেরের গীবত জায়িয নেই

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলেন, এক মজলিসে হযরত উমর রাযি. এর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিসেই জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বদনাম শুরু করে দিল। তখন হযরত ইবনে উমর রাযি. তাকে বাধা দিলেন ও বললেন: "এই যে তুমি তার বদনাম করছ এটা গীবত। আর এটা মনে করবে না যে, যদি হাজ্জাজের গর্দানে শত সহস্র মানুষের রক্তের

ঋণ থাকে, এবং অবশ্যই আছেও বটে, তাই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গীবত হালাল হয়ে গেছে!! অথচ তার গীবত হালাল হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ থেকে ঐসব শত সহস্র খুনের হিসাব নিবেন যা তার গর্দানে চাপানো আছে, তেমনিভাবে তোমাদের ঐসব গীবতেরও হিসাব নেবেন, যা তোমরা তার অবর্তমানে করছো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

সুতরাং এমনটি মনে করবে না যে, অমুক ব্যক্তি ফাসেক, ফাজের বিদআতী! তাই যত মনে চায় অতই তার গীবত করি!! বরং তার গীবত থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়

আরেকটি ক্ষেত্রে শরীয়ত গীবতকে বৈধতা দান করেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, মনে করুন কেউ আপনার উপর জুলুম করেছে। এখন আপনি অন্য কারো নিকট আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, আমার সাথে এই জুলুম হয়েছে। এই বাড়াবাড়ি হয়েছে। তো এটা গীবত নয়, এতে গুনাহ হবে না। চাই ঐ ব্যক্তি যার সামনে আপনি জুলুমের আলোচনা করছেন সে এটার সমাধান করতে পারুক বা না পারুক।

উদাহরণ স্বরূপ কেউ আপনার টাকা পয়সা চুরি করল। এখন আপনি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন যে, আমার টাকা চুরি হয়ে গেছে। অমুক ব্যক্তি আমার টাকা চুরি করেছে। এখন যদিও এটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার আলোচনা কিন্তু তারপরও এটা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেহেতু আপনার ক্ষতি করা হয়েছে, জুলুম করা হয়েছে, আপনি এই জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, আর তারা এই জুলুমের ক্ষতিপূরণও করতে পারে। সুতরাং এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কিন্তু যদি এই চুরির আলোচনা এমন ব্যক্তির সামনে করা হয় যিনি এটার সমাধানে সক্ষম নন, উদাহরণস্বরূপ চুরির ঘটনার পর কিছু

লোক আপনার নিকট আসল। আর আপনি তাদেরকে বললেন যে, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি আমার বাসায় চুরি করেছে অথবা অমুক মানুষটি আমার এই ক্ষতি করেছে তাহলে এতে কোন গুনাহ হবে না। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দেখুন শরীয়তে ইসলামী আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রেখেছে।

মানুষের স্বভাব হল, তার উপর জুলুম হলে সে কমপক্ষে অন্য কারো নিকট এ দুঃখ ব্যথার কথা বলে বুকটাকে হালকা করার চেষ্টা করে। চাই অপর ব্যক্তি তার সমস্যার সমাধান করতে পারুক বা না পারুক। ইরশাদ হচ্ছে–

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ

অর্থাৎ "মন্দ কথার আলোচনা মুখে আনাকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে যার উপর জুলুম হয়েছে।" (তিনি অন্যদের সামনে জুলুমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে পারেন)[৫২]

এটা গীবত হবে না। এটা জায়িয।

যাই হোক, এসব হল হারাম গীবত বহির্ভূত ব্যতিক্রমধর্মী সূরতসমূহ। যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা গীবত থেকে বের করে দিয়েছেন। এতে গীবতের গুনাহ হবে না।

কিন্তু এর বাইরে আমরা মজলিসে বসে আলাপচ্ছলে, সময় পার করার জন্য অন্যের অনুপস্থিতিতে যেসব আলোচনা সমালোচনা ও পর্যালোচনা করি, সেগুলো হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ জানের প্রতি দয়া করে এটা বন্ধ করার চেষ্টা করুন। যবানকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন, একটু মুখে লাগাম দিন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর থেকে বাঁচার তাউফীক দান করুন। আমীন।

---

৫২. সূরা নিসা, আয়াত ১৪৮

গীবত থেকে বাঁচার জন্য সাহস ও হিম্মত

গীবত বিষয়ক আলোচনা আমি আপনাদের সামনে করলাম। আপনারা শুনলেন। কিন্তু শুধুমাত্র বলা বা শোনার দ্বারা কাজ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত পাক্কা নিয়্যত ও দৃঢ় ইচ্ছা না করবে এবং কদম সামনে না বাড়াবে, কাংখিত ফায়েদা হাসিল করা যাবে না।

এখনই পাক্কা নিয়্যত করুন যে, আজকের পর এ যবান দিয়ে আর কখনোই গীবতের কোন শব্দ বের হবে না ইনশাআল্লাহ। কখনো ভুল হয়ে গেলে কালবিলম্ব না করে তাওবা করে নিন। সঠিক চিকিৎসা হল যার গীবত করা হয়েছে, সরাসরি তার নিকট মাফ চাওয়া যে, ভাই! আমার দ্বারা আপনার গীবত হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহর অনেক বান্দা-বান্দী আছেন যারা এ কাজটি করে থাকেন।

গীবত হতে বাঁচার কৌশল

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলেন: অনেকে আমার কাছে এসে বলে, আমি আপনার গীবত করেছিলাম। আমাকে মাফ করে দিন। আমি তাকে বলি যে, আমি তোমাকে মাফ অবশ্যই করব, কিন্তু একটি শর্ত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, প্রথমে আমাকে বল, কী গীবত করেছিলে? যাতে আমি বুঝতে পারি যে, আমার পিছনে আমার ব্যাপারে কী বলা হয়? کہتی ہے تجھے خلقِ خدا غائبانہ کیا؟ আল্লাহ পাকের মাখলূক পর্দার অন্তরালে তোমার ব্যাপারে কী বলে? এটা বললে আমি তোমাকে মাফ করে দিব।

অতঃপর হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. বলেন: আমি এই হেকমতে জিজ্ঞেস করি যে, হতে পারে যে, আমার ব্যাপারে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেটা সঠিক, আর বাস্তবেই আমার মধ্যে সেই ভুলটি আছে। জিজ্ঞেস করার দ্বারা ঐ ভুলটি সামনে এসে গেলে আল্লাহ তাআলা আমাকে সেটা থেকে আত্মরক্ষার তাউফীক দান করবেন।

এজন্য আমি জিজ্ঞেস করে নেই। অতএব কখনো গীবত হয়ে গেলে সেটার চিকিৎসা হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দেয়া যে, ভাই! আমার দ্বারা আপনার গীবত হয়ে গেছে।

ঐ সময় তো অন্তরের উপর করাত চলবে। কারণ নিজ মুখে একথা বলা অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু চিকিৎসা এটাই। দুই চার বার এই চিকিৎসা করলে আল্লাহ পাক চাহেন তো সারা জীবনের শিক্ষা হয়ে যাবে।

বুযুর্গানে দ্বীন এর থেকে পরিত্রাণের জন্য অন্য চিকিৎসার কথাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন: মুখে অন্য মানুষের আলোচনা চলে আসলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের দোষসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর। পৃথিবীতে (নবী-রাসূলগণ ব্যতীত) এমন কোন মানুষ নেই যার কোন দোষ নেই। তো এভাবে চিন্তা করা যে, আমার মধ্যেই তো কত দোষ। আমি কোন্ মুখে অন্যের দোষচর্চা করি? এর পাশাপাশি ঐ আযাবের ধ্যান করতে হবে, যেটার বর্ণনা একটু পূর্বেই গত হয়েছে।

সাথে সাথে মহান আল্লাহর নিকট খুব দু'আ করবে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করুন। কোন মজলিসে কখনো এ জাতীয় আলোচনা আরম্ভ হলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করুন আর বলুন ইয়া আল্লাহ! মজলিসে তো এ আলোচনা চলছে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। যেন আমি এ পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে না পড়ি।

গীবতের কাফফারা

অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যদিও সূত্রগতভাবে সেটা দুর্বল কিন্তু অর্থগতভাবে সহীহ যে যদি কারো গীবত হয়ে যায় তাহলে তার কাফফারা হল তার জন্য খুব দু'আ করবে, ইসতিগফার করবে।

মনে করুন উদাহরণ স্বরূপ আজ কারো গাফলতের নিদ্রা ভঙ্গ হল যে, বাস্তবেই তো এতদিন আমি মারাত্মক ভুলের মধ্যে ছিলাম। জানিনা কোন্ কোন্ মানুষের গীবত করেছি? ইনশাআল্লাহ আগামীতে আর কারো গীবত করবনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত যাদের গীবত করেছে তাদেরকে কিভাবে স্মরণ করবে? এবং তাদের কাছে কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? কোথায় কোথায় যাবে? এজন্য এখন তাদের জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করতে থাকুন।

কারো হক নষ্ট করে থাকলে ক্ষতিপূরণের উপায় কি?

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এবং আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. তো একটা কাজ এই করেছিলেন যে, চিঠি লিখে সকলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন: "জানিনা জীবনে আপনার কত হক নষ্ট করেছি। কত ভুল করেছি, আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

এ চিঠি তাঁরা উভয়ে তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত সকলের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আশা করা যায় এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঐসব হক মাফ করে দিবেন।

কিন্তু কথার কথায় যদি এমন হয় যে, যাদের হক নষ্ট করা হয়েছিল, এখন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, হয়ত তাদের ইন্তিকাল হয়ে গেছে অথবা কোন এমন স্থানে চলে গেছেন যেখানে তার ঠিকানা জানা সম্ভব নয়। তো এসব ক্ষেত্রের জন্য হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন: যার গীবত করা হয়েছিল অথবা যাদের হক নষ্ট করা হয়েছিল, তাদের জন্য খুব দু'আ করুন। "ইয়া আল্লাহ! আমি তার গীবত করেছিলাম এটাকে তার জন্য তার দারাজাত বৃদ্ধির উপলক্ষ বানিয়ে দিন। এবং তাকে দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।"

এটাও ক্ষতিপূরণের একটি পন্থা। যদি আমরা ও আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট এ জাতীয় চিঠি পাঠিয়ে দেই, তাহলে কি আমাদের মাথা হেট হয়ে যাবে? নাকি বেইজ্জতী হবে? এটাও অসম্ভব নয় যে, এর দ্বারা মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমার ব্যবস্থা করে দিবেন।

মাফ করা ও করানোর ফযীলত

হাদীস শরীফে এসেছে, যদি আল্লাহর কোন বান্দা অন্যের কাছে মাফ চায় এবং সাচ্চা দিলে মাফ চায়, আর যার কাছে মাফ চায় সে এটা চিন্তা করে যে, লোকটি লজ্জিত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

করেছে, তাই আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তো আল্লাহ তাআলাও ঐ ক্ষমাকারী ব্যক্তিকে সেদিন ক্ষমা করে দিবেন। যেদিন তার ক্ষমার সব থেকে বেশি প্রয়োজন হবে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, কেউ লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, অথচ এ লোকটি ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে আর বলছে যে, না আমি তোমাকে মাফ করব না! তো আল্লাহ তাআলা বলেন: "আমি তোমাকে ঐদিন ক্ষমা করব না যে দিন তোমার ক্ষমার সব থেকে বেশি প্রয়োজন হবে। যখন তুমি আমার বান্দাদেরকে ক্ষমা কর না, তখন তোমাকে কিভাবে ক্ষমা করা হবে?"

এজন্য এটা বড় ভয়াবহ ব্যাপার। অতএব কেউ লজ্জিত হয়ে অন্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। চাই অপর ব্যক্তি ক্ষমা করুক বা না করুক। সুতরাং হকসমূহের ক্ষমার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষমা প্রার্থনা

আরে আমরা কোন্ কাতারে আছি? একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে সম্বোধন করে বললেন: আজ আমি আমাকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করছি। আমার দ্বারা যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাক অথবা আমি কারো জান মালের কোন ক্ষতি করে থাকি তবে সে আজ আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আর আমাকে ক্ষমা করতে চাইলে ক্ষমা করে দাও। যাতে করে কাল কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন হক আমার উপর অবশিষ্ট না থাকে।

বলুন সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মহান মুহসিন মহান মুরশিদ যাঁর একটি শ্বাসের পরিবর্তে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. নিজ জান কুরবান করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি বলছেন, আমি কাউকে মেরে থাকলে বা কষ্ট দিয়ে থাকলে সে যেন আমার থেকে বদলা নিয়ে নেয়।

ফলশ্রুতিতে একজন সাহাবী রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একবার আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন, আমি আজ সেটার প্রতিশোধ নিতে চাই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি বরং বললেন : আস এবং বদলা নিয়ে নাও। কোমরে আঘাত কর। যখন ঐ সাহাবী কোমরের পিছনে চলে আসলেন তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আপনি আমাকে মেরেছিলেন তখন আমার কোমরে কোন কাপড় ছিল না অথচ এখন আপনার কোমরে কাপড় আছে। এ অবস্থাতেই প্রতিশোধ নিলে প্রতিশোধ পরিপূর্ণ হবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চাদর পরিহিত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঠিক আছে আমি চাদর খুলে ফেলছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর সরানো মাত্রই ঐ সাহাবী আগে বেড়ে ঐ মোহরে নবুওয়াতে চুম্বন করলেন যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠ মুবারকে স্থাপিত ছিল।

অতঃপর ঐ সাহাবী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই গোস্তাখী ও বেআদবী আমি শুধু এ জন্য করেছি যাতে আমার মোহরে নবুওয়াতে চুম্বনের সৌভাগ্য নসীব হয়। নবীজী! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৫৩]

যাই হোক এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর সামনে পেশ করেছেন। এখন আমরা চিন্তা করি আমরা কোন্ অবস্থায় আছি? যদি আমরাও আমাদের সাথে সম্পর্কধারী ব্যক্তিবর্গের নিকট এটা লিখে পাঠিয়ে দেই, তো এতে আমাদের এমন কী সমস্যা?

হতে পারে এর দ্বারা মহান আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। আর সুন্নাতের অনুসরণের নিয়্যতে যখন আমরা এই কাজ

---

৫৩. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৭

করব, তো এই সুন্নাতের বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিবেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামের একটি নীতি

দেখুন, ইসলামের একটি নীতি যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "ঈমানের দাবী হল নিজের জন্য ঐ জিনিসই পসন্দ করবে যা অন্যের জন্য পসন্দ কর। আর অন্যের জন্যও সেই জিনিসই পসন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পসন্দ কর। আর নিজের জন্য যেটা পসন্দ করনা সেটা অন্যের জন্যও পসন্দ করবে না।"[৫৪]

আচ্ছা আপনিই বলুন! যদি কেউ এভাবে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার সমালোচনা করে তখন আপনার কেমন লাগবে? আপনি তাকে ভালো মনে করবেন নাকি মন্দ? যদি আপনি এটাকে নিজের জন্য অপসন্দ করে থাকেন, তাহলে কেন এটাকে অপর ভাইয়ের জন্য পসন্দ করছেন?

এই দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা যে, নিজের জন্য এক মানদণ্ড আর অপরের জন্য আরেক মানদণ্ড এটার নামই "মুনাফেক"। কেমন যেন গীবতের মধ্যে মুনাফেকীও আছে। যখন এ কথাগুলো চিন্তা করবেন এবং এ গুনাহের উপর যে আযাব দেয়া হবে সেটা চিন্তা করবেন, তো ইনশাআল্লাহ্ গীবত করার আগ্রহ কমে যাবে।

গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ

আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে, "গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ হল অন্যের আলোচনাই করবে না। না ভালো আলোচনা, না মন্দ আলোচনা। কেননা শয়তান

৫৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২১৩২

বড় খবীস। যখন আপনি কারো প্রশংসা করে বলবেন "অমুক মানুষ খুব ভালো। তার মধ্যে এই এই গুণ আছে"। তখন মনের মধ্যে এ কথা ঘুরপাক খেতে থাকবে যে, আমি তো তার গীবত করছি না। বরং তার প্রশংসাই করছি। কিন্তু পরবর্তীতে যেটা হবে, সেটা হল তার ভালো আলোচনার মধ্যেই শয়তান এমন কোন বাক্য ঢেলে দিবে যদ্দরূন সেই ভালো কথা খারাপ কথায় এবং সুনাম দুর্নামে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ কেউ বলল : লোকটি খুব ভালো। কিন্তু তার মধ্যে এই খারাপ অভ্যাস আছে। এই "কিন্তু" শব্দটি এসে সমস্ত কীর্তিকে ম্লান করে দিবে। পরিণতিতে আলোচনার গতিপথ গীবতের দিকে বদলে যাবে"।

এ জন্য হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলতেন : অন্যের আলোচনাই করবানা। অন্যের ভালো বা মন্দ আলোচনা করারই কী প্রয়োজন? আর যদি কারো প্রশংসা করতে থাক তবে কোমর কষে বস। যাতে শয়তান তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে।

নিজ বদঅভ্যাসগুলোর দিকে নজর দিন

আরে ভাই! অন্যের সমালোচনা কেন করেন? নিজের বদস্বভাবগুলোর দিকে নজর দিন। অন্যের মধ্যে কোন খারাবী থাকলে সেই খারাবীর শাস্তি তো আর আপনি পাচ্ছেন না। সেই খারাবীর আযাব বা সাওয়াবের ব্যাপার সে জানে ও তার আল্লাহ জানে। আপনি তো পাবেন আপনার আমল (ভালো বা মন্দ) এর বদলা। সেটার ফিকির করুন। নিজের ধ্যান করুন। স্বীয় দোষত্রুটিসমূহ দেখুন।

অন্যের দোষের দিকে নজর মানুষের তখনই যায়, যখন মানুষ নিজের থেকে ও নিজের দোষসমূহ হতে বেখবর হয়ে যায়। কিন্তু যখন নিজ দোষসমূহ তার সামনে উপস্থিত থাকে, তখন অন্যের দোষের দিকে দৃষ্টি যেতেই পারে না। অন্যের সমালোচনা ও গীবত তার যবানে আসতেই পারে না।

সর্বশেষ মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহ যফর রহ. দারুণ সুন্দর কবিতা বলেছেন। তিনি বলেন :

تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر
رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائی پر جو نظر
تو نگاہ میں کوئی برانہ رہا

ছিলে যখন আপন দোষ থেকে তুমি উদাসীন,
অন্যের দোষ দেখে তখন তোমার মুখ হত মলিন।
যেই না পড়ল নিজ খারাবীর প্রতি তোমার নজর,
দৃষ্টিতে আর থাকল না ভেদাভেদ কে আপন কে পর।

মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদের দোষসমূহ আমাদের অন্তরে সব সময় হাযির রাখার তাউফীক দান করুন। আমীন।

এ সমস্ত ফাসাদ ও বিশৃংখলা এজন্যই সৃষ্টি হয় যেহেতু আমার দোষের দিকে আমার দৃষ্টি নাই। আমার অন্তরে এ খেয়াল নাই যে, আমাকে আমার কবরে গিয়ে ঘুমাতে হবে। এই চিন্তা নাই যে, আমাকে আল্লাহ পাকের সামনে জবাব দিতে হবে। এজন্যই কখনো অমুকের বদনাম করি, কখনো তমুকের সমালোচনা করি। তার মধ্যে এই দোষ। ঐ লোকের ঐ সমস্যা, ব্যস দিন রাত এই চক্করে ফেঁসে আছি।

আল্লাহর জন্য এ বদ অভ্যাস হতে নাজাত হাসিল করার চেষ্টা করুন।

আলোচনার ধারা বদলে দিন

যে অবস্থায় আর যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেখানে এ কাজটি যথেষ্ট কঠিন। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি এর থেকে বাঁচা মানুষের সামর্থ্যের বাইরেই হত, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা এটাকে হারাম করতেন না। কেননা এই গীবত ও যবানের গুনাহ

থেকে বাঁচা মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়। কখনো কোন মজলিসে গীবত শুরু হয়ে গেলে আলোচনার ধারা বদলে দিন। আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গীবত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার করে নিন। আর আগামীতে গীবত না করার জন্য আপনার দৃঢ় ইচ্ছাকে পুনরায় তাজা করুন।

"গীবত" সমস্ত অনিষ্টের মূল

মনে রাখবেন, এই গীবত হল একটি ধ্বংসাত্মক বস্তু। এর দ্বারাই পরস্পরে ঝগড়া, অনৈক্য ও সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দেয়।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হল এই গীবত বা পরনিন্দা।

যদি কেউ মদপান করে, (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে দ্বীনের সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্ক আছে সে তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে। তাকে খারাপ মনে করবে এবং এটা চিন্তা করবে যে লোকটি ভীষণ অন্যায় কাজে ডুবে আছে। আর যে ব্যক্তি মদপানে লিপ্ত, সে নিজেও চিন্তা করবে যে, আমার দ্বারা অনেক বড় ভুল হচ্ছে। আমি একটি বড় গুনাহে লিপ্ত।

কিন্তু এর বিপরীতে মনে করুন জনৈক ব্যক্তি গীবত করছে তো তার ব্যাপারে এত খারাবীর অনুভূতি অন্তরে সৃষ্টি হয় না। আর স্বয়ং গীবতকারীরও এই অনুভূতি নাই যে, আমি কোন বড় গুনাহে লিপ্ত।

যার মানে হল আসলে ঐ গুনাহটির ভয়াবহতা অন্তরে ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়নি। আর এর বাস্তবতার ব্যাপারেও পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। নতুবা মদপান ও গীবত উভয় গুনাহের মধ্যে (আল্লাহ পাকের নাফরমানী হওয়ার দিক দিয়ে) কোন পার্থক্য নেই। এটাকে (মদপান) খারাপ মনে করলে ওটাকেও (গীবত) খারাপ মনে করা উচিত।

এজন্য এটা যে কত ভয়াবহ ব্যাধি সেই অনুভূতি অন্তরে সৃষ্টি করুন।

ইশারায় গীবত করা

একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে বসা ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যাহ রাযি. এর আলোচনা চলে আসল। এখন কথা হল সতীনদের মধ্যে মানবিক স্বভাবের চাহিদায় কিছুটা দ্বন্দ ক্লেশ হয়েই থাকে।

হযরত সাফিয়্যাহ রাযি.-এর দৈহিক উচ্চতা কিছুটা কম ছিল। তো আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করে দেন যে, তিনি তো নীচু আকৃতির বেঁটে মহিলা। মুখে এ কথা বলেননি যে, তিনি বেঁটে। বরং শুধু হাত দ্বারা ইশারা করেছেন।

তো হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন, আয়েশা! আজ তুমি এমন একটা কথা বলেছ, যদি এ (বদ) কথাটির দুর্গন্ধ ও বিষ সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয় তাহলে পুরো সমুদ্রকে দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত বানিয়ে দিবে।

এখন আপনি অনুমান করুন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতের সামান্য ইশারার কত খারাবী বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, যদি কেউ আমাকে পুরো পৃথিবীর দৌলতও এনে দেয় তবুও আমি কারো অঙ্গভঙ্গি নকল করতে প্রস্তুত নই। যার মধ্যে অন্যকে ছোট করা হয়। যার মধ্যে কোন খারাবী থাকে।[৫৫]

গীবত হতে বাঁচার চেষ্টা করুন

বর্তমানে তো কারো অঙ্গভঙ্গির অনুসরণ করা সূক্ষ্ম শাস্ত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং এমন মানুষকে প্রশংসা সূচক বাক্যের উপযুক্ত মনে করা হয়। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কেউ

---

৫৫. সুনানে তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৬২৪

যদি সারা পৃথিবীর দৌলতও আমাকে এনে দেয়, তবুও আমি কারো অঙ্গভঙ্গি নকল করতে প্রস্তুত নই।”

এর দ্বারা আপনি অনুমান করতে পারছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত গুরুত্বের সাথে এসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু আমাদের কী হয়েছে বুঝি না। আমরা মদপান, যেনা-ব্যভিচারকে তো খারাপ মনে করি ঠিকই, কিন্তু গীবতকে খারাপ মনে করি না। এটাকে মায়ের দুধের মত মিষ্টি মনে করি। কোন মজলিস এর থেকে খালী থাকে না। আল্লাহর ওয়াস্তে এর থেকে বাঁচার ব্যাপারে যত্নবান হোন।

গীবত হতে বাঁচার পদ্ধতি

এর থেকে বাঁচার পদ্ধতি হল, এর অনিষ্টতার ব্যাপারটি মনের মধ্যে ভালোভাবে বদ্ধমূল করে আল্লাহ তাআলার কাছে এভাবে দু‘আ করবেন “ইয়া আল্লাহ! এই গীবত বড় ভয়াবহ গুনাহ। আমি এর থেকে বাঁচতে চাই। কিন্তু মজলিস এর মধ্যে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলার সময় গীবতও হয়ে যায়। ইয়া আল্লাহ! আমি আমার পক্ষ থেকে পাক্কা নিয়্যত করছি যে, আগামীতে আর গীবত করব না। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকা আপনার তাউফীক ব্যতীত সম্ভব নয়। ইয়া আল্লাহ! আপনার রহমতে আমাকে এর তাউফীক দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে হিম্মত দিন, সাহস দিন।”

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে এ দু‘আ করুন, এ কাজ আজই করুন।

গীবত থেকে বাঁচার পাক্কা নিয়্যত করুন

দেখুন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন কাজের পাক্কা নিয়্যত না করে, অতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন কাজ হয়না। এদিকে শয়তান প্রতিটি কাজকে টলাতে থাকে। আচ্ছা এ কাজটি কাল থেকে আরম্ভ করব। কাল এসে গেল তো কোন অপারগতাও সামনে এসে গেল। আবার

বলি, আচ্ছা কাল থেকে ভালো হয়ে যাব। কিন্তু ঐ কাল আর আসেই না। এজন্য যা করার আজকেই করুন। এখনোই শুরু করুন।

দেখুন যদি কারো রুটি-রুযীর ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সে রোযগারের জন্য অস্থির হবে কি হবে না? কেউ অসুস্থ হলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত পেরেশান থাকবে কি থাকবে না? এরপরও কোন্ সে কারণে আমাদের মধ্যে অস্থিরতা নেই? পেরেশানী নেই? কেন আমাদের থেকে এই বদ অভ্যাস দূর হচ্ছে না? কালবিলম্ব না করে দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করুন, ইয়া আল্লাহ! আমি এই বদ অভ্যাস হতে পরিত্রাণ চাই। আপন রহমতে এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধি হতে আমাকে চিরমুক্তি দান করুন। আমাকে ইস্তিকামাত তথা অটলতা ও অবিচলতা দান করুন।

দু'আ করার পর এটার পাক্কা নিয়্যত করে নিজের উপর পাবন্দী তথা বাধ্য বাধকতা আরোপ করুন।

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলেন: যদি এর দ্বারা কাজ না হয়, তাহলে নিজের উপর জরিমানা ধার্য করুন। উদাহরণস্বরূপ পাক্কা নিয়্যত করুন যে, যখনই আমার দ্বারা গীবত হবে তখনই আমি নফসকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নফল নামায পড়ব। অথবা এত টাকা সদকা করব। এভাবে আমল করতে থাকলে ধীরে ধীরে ইনশাআল্লাহ এর থেকে নাজাত বা মুক্তি লাভ হবে।

আর এই গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য এমন অস্থিরতা সৃষ্টি হতে হবে, যেমন অসুস্থ মানুষ চিকিৎসা করানোর জন্য অস্থির থাকে। কেননা এটাও একটি (রূহানী) ব্যাধি ও রোগ। এবং অত্যন্ত ভয়াবহ একটি ব্যাধি। বরং এটা শারীরিক ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক। কেননা এই ব্যাধি মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

এজন্য নিজেও এর থেকে বাঁচব, পরিবার এর সদস্যদের কেও বাঁচাব। কেননা বিশেষ ভাবে মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাধিটি খুব বেশি

ব্যাপক। যেখানেই চারজন মহিলা বসবে, ব্যস কারো না কারো আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। গীবত আরম্ভ হয়ে যাবে। যদি মহিলাগণ এ কথাগুলোর উপর যথাযথভাবে আমল আরম্ভ করে দেন এবং এ গুনাহ থেকে বেঁচে যান, তাহলে ঘরের অন্যান্য সদস্যদেরও ইসলাহ তথা সংশোধন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাকেও আমল করার তাউফীক দান করুন এবং আপনাদেরকেও আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

"چغلی" ایک سنگین گناہ

চোগলখোরী: একটি ভয়াবহ গুনাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

গীবতের কাছাকাছি আরেকটি গুনাহ, যেটা গীবতের মতই ভয়াবহ বরং তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ সেটা হল "چغلی" আরবীতে যাকে "نَمِيْمَةٌ" (নামীমাহ) বলা হয়। উর্দূ ভাষায় نميمة এর অর্থ چغلی দ্বারা করা হয়। কিন্তু শব্দটার এ তরজমা সহীহ নয়। কেননা نميمة এর হাকীকত বা স্বরূপ হল: কোন ব্যক্তির মন্দ আলোচনা অন্যের সামনে এ নিয়্যতে করা, যাতে শ্রবণকারী ঐ ব্যক্তিকে কোন কষ্ট পৌঁছায়। আর এ ব্যক্তি আনন্দিত হয় যে, যাক ভালো হল তার কষ্ট হল। এই হল نميمة এর সংজ্ঞা।

আর এক্ষেত্রে এটা জরূরী নয় যে, যে দোষটার কথা সে বলেছে সেটা বাস্তবেই তার মধ্যে থাকতে হবে। চাই সে খারাবীটা তার মধ্যে থাক বা না থাক। কিন্তু আপনি শুধু এ কারণে এটা বললেন যেন অপর ব্যক্তি তাকে কষ্ট পৌঁছায়, এই হল "نميمة"।

"চোগলখোরী" গীবতের চেয়েও ভয়াবহ গুনাহ

কুরআন-হাদীসে এর প্রচুর নিন্দাবাদ এসেছে। আর এটা গীবতের চেয়েও ভয়াবহ হওয়ার কারণ হল, গীবতের মধ্যে নিয়্যত খারাপ হওয়া শর্ত নয় যে, আমি যার গীবত করছি তার যেন কোন দুঃখ-কষ্ট, পৌঁছে, কিন্তু نميمة বা চোগলখোরীর ক্ষেত্রে নিয়্যত খারাপ হওয়াও জরূরী। এজন্য এই চোগলখোরী দুটি গুনাহের সমষ্টি হল, একটা তো

হল এর মধ্যে গীবত আছে। আর আরেকটা হল অন্য মুসলমানকে কষ্ট পৌঁছানোর ইচ্ছাও এর মধ্যে আছে। এজন্য এতে ডবল গুনাহ।

এজন্যই কুরআন-হাদীসে এর ব্যাপারে বড় মারাত্মক ধমকী এসেছে।

তাইতো ইরশাদ হয়েছে-

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

কাফেরদের স্বভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে যে, সে ঐ ব্যক্তির মত চলাফেরা করে যে অন্যের ভর্ৎসনাকারী এবং চোগলখোর।[৫৬]

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থাৎ "চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৫৭]

কবরের আযাবের দুটি কারণ

একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক স্থানে দেখলেন যে, দুটি কবর। কবরের কাছাকাছি পৌঁছার পর ঐ কবর দুটির দিকে ইশারা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ দুটি কবরে আযাব হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কবরের আযাবের তথ্য জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এই কবরের আযাব এমন একটা জিনিস, একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যখন কারো আযাব হয়, তখন মহান আল্লাহ নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের থেকে কবর আযাবের আওয়াযকে লুকিয়ে রাখেন। নতুবা যদি আমরা ঐ আযাবের

---

৫৬. সূরাতুল কলম, আয়াত ১১

৫৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৪৫

আওয়াজ শুনতে পেতাম, তাহলে কোন মানুষ জীবিত থাকত না। আর যিন্দেগীতে কোন কাজ করতে পারত না। এজন্য এটা আল্লাহর রহমত যে, তিনি আমাদের থেকে কবরের আযাবকে লুকিয়ে রেখেছেন।

অবশ্য অনেক সময় বিশেষ কোন হেকমতের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন কোন বান্দার উপর এটাকে প্রকাশও করে দেন।

যাই হোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছেন যে, এ দুটি কবরে আযাব হচ্ছে। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে জিজ্ঞেস করেছেন, আচ্ছা তোমরা জান কি কোন্ কারণে এ কবর দুটিতে আযাব হচ্ছে?

অতঃপর নিজেই বললেন: এমন কারণে এ কবর দুটিতে আযাব হচ্ছে যেগুলো থেকে বাঁচা তাদের জন্য কোন কঠিন কাজ ছিল না। তারা চাইলে সহজেই বাঁচতে পারত। কিন্তু যেহেতু তারা সতর্কতা অবলম্বন করেনি, তাই আযাব হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন পেশাবের ছিঁটা হতে সাবধান থাকত না। উদাহরণস্বরূপ এমন স্থানে পেশাব করে দিল, যেটার কারণে শরীরে পেশাবের ছিঁটা চলে আসল।

বিশেষ করে ঐ যুগে যেহেতু উট বকরী লালন-পালনের ব্যাপক রেওয়াজ ও প্রচলন ছিল, আর সব সময় ঐ প্রাণীদের সাথে থাকতে হত, যদ্দরুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সব প্রাণীর ছিঁটা গায়ে এসে পড়ত। এর থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে কবরে আযাব হচ্ছিল।[৫৮]

পেশাবের ছিঁটা হতে বেঁচে থাকুন

এটা খুবই চিন্তার ব্যাপার। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইসলাম ধর্মে তাহারাত বা পবিত্রতার আদাব বিস্তারিতভাবে শেখানো হয় যে, কিভাবে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে?

কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা তথাকথিত সভ্যতার প্রভাবে বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু শরয়ী পবিত্রতার বিধি-বিধানের প্রতি আমাদের কোন লক্ষ্যই নেই।

---

৫৮. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃ: ৪৯

এমনভাবে বাইতুল খালা বা শৌচাগার বানানো হয় যেখানে পেশাবের ছিঁটা হতে বেঁচে থাকা কার্যত প্রায় অসম্ভব।

অপর এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

অর্থাৎ "তোমরা পেশাবের ছিঁটা হতে সাবধান থেকো। কেননা কবরের অধিকাংশ আযাব পেশাবের ছিঁটা হতে সতর্ক না থাকার কারণে হয়।"[৫৯]

পেশাবের ছিঁটা শরীরে বা কাপড়ে লেগে যাওয়ার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবরের আযাব হয়। এজন্য এ ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কতা প্রয়োজন।

চোগলখোরী থেকে বাঁচুন

আর দ্বিতীয় ব্যক্তির আযাবের কারণ হল সে অনেক বেশি চোগলখোরী করত। একজনের কথা অন্য জনের কাছে লাগিয়ে পরস্পরে দ্বন্দ্ব বিবাদ সৃষ্টি করত।

তো এটাও কবরের আযাবের অন্যতম প্রধান কারণ।

এই চোগলখোরী গীবতের চেয়েও ভয়াবহ গুনাহ। কেননা এখানে খারাপ উদ্দেশ্যে অন্যের সামনে কারো দোষচর্চা করা হয়। যাতে করে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে কষ্ট পৌঁছায়।

গোপন রহস্য ফাঁস করাও চোগলখোরী

ইমাম গাযালী রহ. ইহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন গ্রন্থে লিখেছেন যে, অন্যের কোন গোপন রহস্য ফাঁস করে দেয়াও চোখলখোরীর অন্তর্ভুক্ত।

একজন মানুষ এটা চাচ্ছে না যে, আমার কথা অন্যদের সামনে ফাঁস হোক। সে কথাটা ভালো হোক বা খারাপ। সেটার ব্যাপারে আলোচনা

---

৫৯. সুনানে দারাকুতনী, খণ্ড ১, পৃ: ১২৮

নেই। উদাহরণস্বরূপ একজন ধনী মানুষ যে তার সম্পদের পরিমাণ অন্যদের কাছে গোপন রাখতে চায়। আর সে এটা চায় না যে, অন্য কেউ জানুক আমার এত মাল দৌলত আছে। এখন আপনি কোনভাবে শুনে টুনে সন্ধান পেলেন যে, এ লোকের কাছে এত এত...সম্পদ আছে।

ফলে আপনি সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছেন যে, তার কাছে এত দৌলত আছে! এই যে তার গোপন ভেদ আপনি ফাঁস করে দিলেন এটাও চোগলখোরীর অন্তর্ভুক্ত ও হারাম।

অথবা মনে করুন এক ব্যক্তি স্বীয় পারিবারিক ব্যাপারে কোন প্লান বা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রেখেছেন। আপনি কোনভাবে ব্যাপারটা জানতে পেরে অন্যের সামনে এটা বর্ণনা করা আরম্ভ করে দিলেন। এটাও চোগলখোরী।

এমনিভাবে যে কোন গোপন ভেদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত অন্যের সামনে ফাঁস করা চোগলখোরীর অন্তর্ভুক্ত।

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَلْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ

অর্থাৎ "মজলিসের মধ্যে যে কথা বলা হয় সেটাও আমানত"।[৬০]

উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি আপনাকে বিশ্বাস করে মজলিসে আপনাকে একটা কথা বললেন। এখন আপনি ঐ কথাটি সারা দুনিয়ায় বর্ণনা করে চলেছেন। জনে জনে বলে বেড়াচ্ছেন। তো এটা আমানতের খেয়ানত। এবং এটাও চোগলখোরীর অন্তর্ভুক্ত হারাম।

যবানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুনাহ

যাই হোক যবানের গুনাহসমূহের মধ্যে আজকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুনাহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল। এ দুটি গুনাহ বড় মারাত্মক ও ভয়াবহ।

---

৬০. সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৮৬৯

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে আশা করি এর ভয়াবহতা আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অথচ যবানের এমন ভয়াবহ দুটি গুনাহ তথা গীবত ও চোগলখোরীর ব্যাপারে বর্তমানে চরম লাপরোয়া ভাব ও দুঃখজনক উদাসীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গীবত ও চোগলখোরীর আলোচনায় আজ আমাদের মজলিস ও মাহফিল পরিপূর্ণ। ঘরোয়া আড্ডা ও আলোচনাও এগুলোর দ্বারা সরগরম।

যবান কাঁচির মত অনবরত চলছে। থামার কোন নাম গন্ধও নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে এতে লাগাম দিন। একে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী চালানোর ফিকির বা চিন্তা করুন।

নতুবা এর পরিণতিতে ঘরের পর ঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরস্পরে মনোমালিন্য সৃষ্টি হচ্ছে। ফিতনা, দুশমনী ও শত্রুতা পয়দা হচ্ছে। আল্লাহ পাক ভালো জানেন। এগুলো কত অসংখ্য গুনাহ ও ফিত্‌নার মাধ্যম ও উপলক্ষ। আর আখেরাতে তো এটার কারণে যে আযাব বা শাস্তি হবে, সেটা আপন জায়গায় আছেই।

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহ ও রহমতে এর অনিষ্টতা ও খারাবী বুঝার তাউফীক দান করুন এবং এর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

حسد: ایک معاشرتی ناسور

হিংসা: একটি সামাজিক দুষ্টক্ষত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাদ হামদ ও সালাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ.

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা নিশ্চয়ই হিংসা নেক আমলসমূহকে ঐভাবে গ্রাস করে ফেলে যেমন আগুন কাষ্ঠখন্ড বা শুকনো ঘাসকে গ্রাস করে ফেলে।"[৬১]

হিংসা একটি আত্মিক ব্যাধি

যেমনিভাবে মহান আল্লাহ আমাদের বাহ্যিক আমলসমূহের মধ্যে কিছু কিছু জিনিসকে ফরয এবং ওয়াজিব ঘোষণা করেছেন অনুরূপভাবে আমাদের অভ্যন্তরীণ আমলসমূহের মধ্যে অনেকগুলো আমল ফরয। আবার অনেক আমল আছে যেগুলো গুনাহ এবং হারাম। এগুলো হতে সতর্ক থাকাও সেরকমই জরূরী যেমনটি জরূরী প্রকাশ্য গুনাহ হতে বেঁচে থাকা।

আজ আমরা এমনই এক ভয়াবহ আত্মিক ব্যাধি সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। সেই ব্যাধিটি হল "হিংসা"।

---

৬১. সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব, হিংসা অধ্যায়, হাদীস নং ৪৯০৩

হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে

একটা তো হল ঐ আগুন যা বড় মারাত্মক। যা মিনিটের মধ্যে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। আরেকটা হল ঐ আগুন যা ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে। এই আগুন কারো শরীরে লেগে গেলে এক মুহূর্তে তাকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয় না বরং ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে এবং অল্প অল্প করে তাকে গ্রাস করতে থাকে। এমনকি পুরো কাষ্ঠখণ্ড জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে হিংসা এমন একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি যা ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে এবং মানুষের খবরও থাকেনা যে, আমার নেকীসমূহ খতম হয়ে যাচ্ছে। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকীদ করেছেন।

হিংসা থেকে বাঁচা ফরযে আইন

কিন্তু যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব, এই হিংসার ব্যাধি পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। আল্লাহ পাকের খুব কম বান্দাই এমন আছেন যারা এ ব্যাধি থেকে মুক্ত। নতুবা কোন না কোনভাবে হিংসা অন্তরে এসেই পড়ে। অথচ এর থেকে বাঁচা ফরযে আইন। এটা থেকে আত্মরক্ষা ব্যতীত উপায় নেই। কিন্তু আমাদের এদিকে ধ্যান বা খেয়ালই যায় না যে, আমরা এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এজন্য এ থেকে বাঁচার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন জরূরী।

প্রথমে এটা বুঝে নিন যে, হিংসার প্রকৃত মর্ম কী? এবং এটা কয় প্রকার ও কী কী? এর উপলক্ষসমূহ কী কী? এবং এর চিকিৎসাই বা কি? এই চারটি কথা আমার আজকের বয়ানের আলোচ্য বিষয়।

আল্লাহ তাআলা এই বয়ানকে আমাদের অন্তরসমূহ হতে এই ব্যাধি দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

হিংসার সংজ্ঞা

হিংসার সংজ্ঞা হল একজন আরেকজনকে দেখল যে, তার কোন নেয়ামত লাভ হয়েছে। চাই সে নেয়ামত দুনিয়ার হোক বা দ্বীনের। এই নেয়ামত দেখে তার অন্তরে জ্বালা যন্ত্রণা বা কষ্ট সৃষ্টি হল যে, সে এই নেয়ামত কেন পেল? আর মনের মধ্যে এই কুবাসনা জাগ্রত হল যে, এই নেয়ামত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক। এই হল হিংসার সংজ্ঞা।

উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন বান্দাকে মাল দৌলত দিয়েছেন। অথবা কাউকে দিয়েছেন সুস্বাস্থ্য। আবার কাউকে দিয়েছেন প্রসিদ্ধি। আবার কাউকে দিয়েছেন সম্মান। কাউকে দিয়েছেন ইলম বা জ্ঞান।

এখন অন্য কারো অন্তরে এই খেয়াল জাগ্রত হচ্ছে যে, এই নেয়ামত সে কেন পেল? তার থেকে যদি এ নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হত, তবে ভাল হত।

আর ঐ ব্যক্তির মনের বিপরীত কোন অবস্থা সামনে আসলে সে খুশী হয় এবং তার উন্নতি বা সাফল্য সামনে আসলে অন্তরে ব্যথা ও কষ্ট অনুভূত হয় যে, সে কেন আগে বেড়ে গেল? এটার নামই হিংসা।

এখন হিংসার এই বাস্তবতা কে সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝে আসবে যে, হিংসুক ব্যক্তি মূলত মহান আল্লাহর তাকদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন করে যে, আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামত তাকে কেন দিলেন? আমাকে কেন দিলেন না? এটা তো মহান আল্লাহর ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি! নিজ অনুগ্রহকারী মহান দাতার উপর আপত্তি!! আবার সাথে সাথে এ আকাঙ্খাও করছে যেন কোনভাবে এই নেয়ামত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। এ কারণেই এর ভয়াবহতা অনেক বেশি।

"ঈর্ষা" করা জায়িয

আরেকটা ব্যাপার বুঝে নিন। অনেক সময় এমন হয় যে, অন্যের মধ্যে কোন নেয়ামত দেখে সেটা নিজের জন্য হাসিল হওয়ার আকাঙ্খা

জাগে। তো এটা ভাল। এটা হাসাদ বা " হিংসা" নয় বরং "ঈর্ষা"। আরবীতে এটাকে "গিবতা" বলা হয়। অবশ্য অনেক সময় আরবী ভাষাতে এটার ক্ষেত্রেও "হাসাদ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা হিংসা নয়। উদাহরণস্বরূপ কারো ভালো বাড়ি দেখে অন্তরে এ আকাঙ্খা জাগ্রত হল যে, যেমনিভাবে এর বাড়ী সুন্দর ও আরামদায়ক আমারও যদি এমন একটা বাড়ি হত। অথবা উদাহরণস্বরূপ যেরকম চাকুরী সে পেয়েছে, সে রকম একটা চাকুরী যদি আমারও হত। অথবা আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে যেমন ইলম দান করেছেন সেরকম ইলম যদি আমারও থাকত। এগুলো হিংসা নয় বরং ঈর্ষা। এতে কোন গুনাহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্তরে অপর ভাই বা বোনের নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার আকাঙ্খা জাগ্রত হয় তবে সেটাই হবে হিংসা। যা সম্পূর্ণ হারাম।

হিংসার তিনটি স্তর

হিংসার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হল অন্তরে এমন চাহিদার উদ্রেক হওয়া যে, আমারও এমন নেয়ামত হাসিল হোক। এখন যদি অন্যজনের কাছে থাকা অবস্থায় হাসিল হয়, তাহলে তো খুব ভাল। নতুবা তার থেকে যেন ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সেটা আমার হয়ে যায়।

এটা হল হিংসার প্রথম স্তর। এখানে প্রথম পদক্ষেপে আকাংখা হল সেটা ছিনিয়ে নেয়া হোক। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপে আকাংখা হল যেন সেটা আমি পেয়ে যাই। এটা হিংসার দ্বিতীয় স্তর।

হিংসার তৃতীয় স্তর হল অন্তরে এমন বাসনা জাগ্রত হল যে, এই নেয়ামত যে কোনভাবে তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক। এবং এ নেয়ামতের কারণে তার যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয়েছে, সেটা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাক। পরবর্তীতে সেই নেয়ামত আমার হাসিল হোক বা না হোক।

এটা হিংসার সব থেকে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম স্তর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব থেকে হেফাযত রাখুন। আমীন।

সর্বপ্রথম হিংসাকারী

সর্বপ্রথম হিংসাকারী হল ইবলীস। যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ ঘোষণা করে দেন যে, আমি একে পৃথিবীতে আমার খলীফা বানাব। খেলাফত দান করব। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর মর্যাদা প্রকাশের জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা হযরত আদম আ. কে সেজদা করে। ব্যস এই নির্দেশ শুনে ইবলীস জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল যে, আদমের আ. এই মর্যাদা নসীব হল, আমার হল না। ফলশ্রুতিতে সে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। সুতরাং সর্বপ্রথম হিংসাকারী হল শয়তান। আর সর্বপ্রথম অহংকারকারীও শয়তান।

হিংসার অনিবার্য পরিণতি

আর এই হিংসার একটি অনিবার্য পরিণতি এই হয় যে, যার সাথে হিংসা করা হয়, যদি তার উপর কোন মুসীবত পৌঁছে তবে এই হিংসাকারী তার দুঃখ-মুসীবত দেখে আনন্দিত হয়। আর যদি তার উন্নতি দেখে বা সে কোন নেয়ামত পেয়ে যায়, তবে এই হিংসুক ব্যক্তি হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকে। অন্যের কষ্টের উপর আনন্দিত হওয়াকে আরবীতে شَمَاتَةٌ বলা হয়। এটাও হিংসার একটি প্রকার। কুরআনে কারীম ও হাদীসে পাকের কয়েকটি স্থানে এর নিন্দাবাদ করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اَمۡ یَحۡسُدُوۡنَ النَّاسَ عَلٰی مَاۤ اٰتٰىہُمُ اللّٰہُ

অর্থাৎ "নাকি তারা এই কারণে মানুষের প্রতি হিংসা করে যে, তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করেন।"[৬২]

---

৬২. সূরা নিসা: ৫৪

হিংসার কারণ দুটি

এই হিংসা ব্যাধির কারণ কি? আর এই ব্যাধি অন্তরে কেন সৃষ্টি হয়? এর কারণ দু'টি। এর একটি কারণ হল দুনিয়ার মাল দৌলতের ভালবাসা। পদের মোহ। এজন্য মানুষ সব সময় কামনা করে যেন আমার এত বড় মর্যাদা হাসিল হয়। আমি যেন উঁচু থাকতে পারি। এখন যদি অন্য কেউ আগে বেড়ে যায় তখন এ তাকে নিচে নামানোর ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দেয়। এই ব্যাধির অপর কারণ হল "ঘৃণা" ও "বিদ্বেষ"। উদাহরণস্বরূপ কারো ব্যাপারে অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল, আর ঐ বিদ্বেষের ফলে তার আরাম দেখলে কষ্ট লাগে। সুখ দেখলে দুঃখ লাগে। অন্তরে এ দু'টি জিনিস থাকলে অনিবার্য ফলস্বরূপ হিংসা পয়দা হবে।

হিংসার দরুন দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি ধ্বংস হয়ে যায়

এই হিংসা এমনই মারাত্মক একটি আত্মিক ব্যাধি যে, মানুষের আখেরাতকে ধ্বংস করে দেয়। বরং দুনিয়াতেও মানুষের জন্য ধ্বংসশীল একটি রোগ। কাজেই এটার কারণে দুনিয়ারও ক্ষতি। আখেরাতেরও ক্ষতি। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করে, সে সব সময় দুঃখ-কষ্টে থাকবে। কেননা যখনই সে দেখবে যে, অপরজন তার থেকে আগে বেড়ে যাচ্ছে, তখন তাকে দেখে তার অন্তরে দুঃখ-ব্যথা সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাবে।

হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে

আরবী ভাষায় একটি কবিতা আছে। যার ভাবার্থ হল, হিংসার উদাহরণ হল আগুনের ন্যায়। আর আগুনের বৈশিষ্ট্য হল সে গ্রাস করার মত কোন বস্তু পেলে সেটাকে গ্রাস করতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ লাকড়ীতে আগুন লাগল, তো ঐ আগুন লাকড়ীটাকে গ্রাস করতে থাকবে। কিন্তু যখন লাকড়ী শেষ হয়ে যাবে, তখন আগুনের এক অংশ অপর অংশকে খাওয়া শুরু করে দিবে। এমনকি ঐ আগুনও শেষ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে হিংসার আগুনও এমন। হিংসাকারী ব্যক্তি প্রথমে তো অন্যকে খারাপ করার এবং অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন অন্যের ক্ষতি করতে পারে না, তখন হিংসার আগুনে নিজে জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

হিংসার প্রথম চিকিৎসা

এই হিংসা রোগের চিকিৎসা হল ঐ ব্যক্তি এটা চিন্তা করবে যে, মহান আল্লাহ এ জগতে আপন বিশেষ হেকমত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে নিজ নেয়ামতসমূহ বণ্টন করেছেন। কাউকে এই নেয়ামত দিয়েছেন, তো কাউকে দিয়েছেন ঐ নেয়ামত। কাউকে সু-স্বাস্থ্যের নেয়ামত দিয়েছেন, কাউকে ধন-সম্পদের নেয়ামত দিয়েছেন। কাউকে দিয়েছেন ইজ্জত-সম্মানের নেয়ামত। কাউকে দিয়েছেন সৌন্দর্যের নেয়ামত। আবার কাউকে দিয়েছেন প্রশান্তির নেয়ামত। এ পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে কোন না কোন নেয়ামত পায়নি। অথবা কোন না কোন কষ্টে নিপতিত নেই।

তিন জগত

কেননা মহান আল্লাহ তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন। একটি হল ঐ জগত যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। সেটা হল জান্নাতের জগত। মহান আল্লাহ আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে সেখানে পৌঁছে দিন। আমীন। সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। আরামই আরাম।

আরেকটা জগত ঠিক এর বিপরীত। যার মধ্যে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। দুঃখ আর দুঃখ। ব্যথা আর ব্যথা। সুখ শান্তির কোন নাম নিশানাও সেখানে নেই। সেটা হল জাহান্নামের জগত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তৃতীয় একটি জগত আছে সেটা উভয়টার সমন্বয়ে গঠিত। যার মধ্যে সুখও আছে, দুঃখও আছে, শান্তিও আছে, অশান্তিও আছে। সেটা হল এ পৃথিবীর জগত। যেখানে আমরা বসবাস করছি। এই পৃথিবীর জগতে এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না যে এ কথা বলবে যে,

আমার সারা জীবনে কখনো কোন কষ্ট হয়নি। আবার এমন কোন মানুষও পাওয়া যাবে না যার কখনো আরাম বা শান্তি লাভ হয়নি। এ জগতে প্রত্যেক খুশীর সাথে দুঃখের কাঁটাও লাগানো থাকে। আর প্রত্যেক কষ্টের মধ্যে শান্তিও লুকায়িত থাকে। এখানের সুখও নিরবিচ্ছিন্ন নয়, আবার এখানের দুঃখও নিরবিচ্ছিন্ন নয়।

প্রকৃত শান্তি পেয়েছে কে?

যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আপন হেকমতে পুরো জগত সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে একেক জনকে একেক নেয়ামত দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্যের নেয়ামত দান করেছেন, তো অপর কাউকে তার বিপরীত ধন-সম্পদের নেয়ামত দান করেছেন। এখন ধন-সম্পদওয়ালা ব্যক্তি স্বাস্থ্যওয়ালা ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করছে যে, সে এতো ভাল স্বাস্থ্য কেন পেল? আবার এদিকে ঐ স্বাস্থ্যওয়ালা ব্যক্তি ধন-সম্পদওয়ালার ব্যাপারে হিংসা করছে যে, সে এত এত সম্পদ কিভাবে পেল?

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা হল তাকদীরের ফয়সালা এবং তারই হেকমত ও মাসলাহাত এর উপর নির্ভরশীল। আর কোন মানুষ অন্যের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবে না যে, কোন্ মানুষ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শান্তিতে আছে।

বাহ্যিকভাবে অনেক সময় দেখা যায় একজন মানুষের অনেকগুলো কারখানা চলছে। বাংলো দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ী চলছে, চাকর নকর আছে, দুনিয়া ভর্তি আরাম আয়েশের উপকরণ বিদ্যমান। পক্ষান্তরে একজন শ্রমিক মানুষ যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর ভাঙ্গে, আর অতি কষ্টে নিজ পেট ভরার ব্যবস্থা করে। এখন যদি এই শ্রমিক ঐ ধন সম্পদশালী মানুষটাকে দেখে তাহলে এটাই চিন্তা করবে যে, সে তো পৃথিবীর অনেক বড় বড় নেয়ামত পেয়েছে।

কিন্তু যদি সাথে সাথে উভয় জনের ভিতরগত জীবনে উঁকি মেরে দেখা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, যে ব্যক্তির মিল কারখানা প্রতিষ্ঠিত, যার বাড়ী গাড়ী আছে, আর যার কাছে অসংখ্য ধন সম্পদ ও সীমাহীন

প্রাচুর্যের উপলক্ষ বিদ্যমান; তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, রাতে যখন বিছানায় শোয় তো ঐ সাহেব বাহাদুরের ঐ সময় পর্যন্ত ঘুম আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমের ট্যাবলেট না খায়! অথচ তার দস্তরখানে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী বিদ্যমান। নানা ধরণের ফল-ফ্রুট উপস্থিত, কিন্তু তার পাকস্থলী এত খারাপ যে, এক দুই লোকমাও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। কেননা তার পাকস্থলীতে হয়েছে আলসার। এজন্য ডাক্তার সাহেব নিষেধ করে দিয়েছেন অমুক অমুক জিনিস খাবেন না। এখন সমস্ত নেয়ামত সমস্ত খাদ্য তার জন্য বেকার। এবার আপনিই বলুন কোন্ ব্যক্তি শান্তিতে আছে? যার কাছে শান্তি সুখের সমস্ত আসবাব আছে কিন্তু সে ঘুম হতে বঞ্চিত, খানা হতে বঞ্চিত। আর আরেকজন মানুষ সাধারণ শ্রমিক। যে আট ঘণ্টার কঠিন ডিউটি দেয়ার পর শাক-রুটি আর চাটনী রুটি খুব ক্ষুধা লাগার পর স্বাদ ও মজা নিয়ে খায়। আর যখন বিছানায় ঘুমায় তখন সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। আট-দশ ঘণ্টা পর্যন্ত ভরপুর ঘুম দিয়ে উঠে।

প্রকৃত শান্তি কার মধ্যে আছে? গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝে আসবে যে, প্রথম ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসবাব ও সামান নিঃসন্দেহে দান করেছেন। কিন্তু প্রকৃত শান্তি দান করেছেন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে। এসবই হল মহান আল্লাহর হেকমতের ফয়সালা।

‘রিযক’ একটি নেয়ামত আর ‘খাওয়ানো’ আরেকটি নেয়ামত

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. আল্লাহ তাআলা তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন, আমীন। একবার বলছিলেন: খানার পরে এই যে দু‘আ পড়া হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খানা খাইয়েছেন এবং এ রিযিক আমাকে আমার কোন প্রচেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই

দান করেছেন। যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এ দু'আ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার অতীতের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দিবেন।"[৬৩]

অতঃপর আমার সম্মানিত পিতা বলেনঃ এ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। একটি হল رَزَقَنِيْهِ আর অপরটি হল أَطْعَمَنِيْ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে রিযিক দিয়েছেন এবং এ খানা খাইয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন উভয় শব্দের মর্ম একই, তখন উভয়টিকে পৃথক পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করলেন? একটি শব্দই বলে দেয়া যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি নিজেই উত্তর দিয়ে বলেন, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা রিযিক হাসিল হওয়া একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত আর খানা খাওয়ানো আরেকটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। কেননা অনেক সময় রিযক হাসিল হওয়ার নেয়ামত তো হাসিল হয় যে, ঘরে উন্নত খানা রান্না অবস্থায় প্রস্তুত, আর সব ধরণের ফল-ফ্রুট বিদ্যমান কিন্তু ক্ষুধা লাগছেনা। পাকস্থলী খারাপ। আর ডাক্তার সাহেবও গুরুপাক জাতীয় খাদ্য খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এখন এমতাবস্থায় رَزَقَنَا তো হাসিল আছে, কিন্তু أَطْعَمَنَا হাসিল নেই। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রিযিক দিয়ে রেখেছেন কিন্তু খাওয়ার যোগ্যতা এবং হজম করার শক্তি দেননি।

যাই হোক, এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার হেকমত ও মাসলাহাত আছে যে, একেক জনকে একেক নেয়ামত দান করেছেন।

মহান আল্লাহর হেকমতের ফয়সালা

এজন্য হিংসার চিকিৎসা হচ্ছে এই যে, হিংসুক ব্যক্তি এটা চিন্তা করবে যে, যদি অন্য কেউ বড় কোন নেয়ামত হাসিল করে, আর সেটার কারণে তার অন্তরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়, তাহলে কত নেয়ামত তো এমনও আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাকে দান করেছেন আর ঐ ব্যক্তিকে দান করেননি। হতে পারে মহান আল্লাহ তোমাকে তার থেকে ভালো স্বাস্থ্য দান করেছেন। অথবা হতে পারে যে মহান

৬৩. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫২৩

আল্লাহ তোমাকে তার থেকে বেশি সৌন্দর্য দান করেছেন, অথবা অন্য কোন নেয়ামত মহান আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন, যেটা সে পায়নি।

সুতরাং এসব নেয়ামতের বণ্টনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হেকমত ও গূঢ় তত্ত্ব আছে। যেটা মানুষ বলতেও পারে না। এভাবে চিন্তা করলে হিংসা ব্যাধি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

উর্দূ ভাষার একটি প্রবাদ

এই যে উর্দূ ভাষায় একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ যে,

اللہ تعالی گنجے کو ناخن نہ دے

"আল্লাহ তাআলা টাক মাথা বিশিষ্ট মানুষকে নখ না দিক" এটা দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত উদাহরণ। যার মর্ম হল, যদি মাল দৌলতের নেয়ামত তোমার হাসিল না থাকে, যদি তোমার এসব থাকত তাহলে না জানি এর কারণে তুমি কী ফাসাদ সৃষ্টি করতে আর কোন আযাবে লিপ্ত হতে! আর এটার কী পরিমাণ অবমূল্যায়ন করতে, যদ্দরুন তোমার অবস্থা না জানি কেমন হত, এখন যখন মহান আল্লাহ তোমাকে এ নেয়ামত দেননি সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে দেননি।

এজন্যই কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ

অর্থাৎ "মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কতক কে কতকের উপর যা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, সেটার আকাংখা করো না।"[৬৪]

কেন? কারণ তোমার কী জানা আছে যে যদি ঐ নেয়ামত তোমার হাসিল হত, তাহলে তুমি কী দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে!! এমন ঘটনা প্রায়ই শোনা যায় যে, একজন মানুষ আকাংখা করে যে, আহা আমি যদি ঐ নেয়ামতটি পেতাম, কিন্তু যখন ঐ নেয়ামতটি পেয়ে যায়, তখন সেটা উপকারী হওয়ার পরিবর্তে তার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

---

৬৪. সূরা নিসা: ৩২

এজন্য সর্বপ্রথম এটা চিন্তা করা উচিত যে, এই যে অন্য কেউ নেয়ামত পেয়ে যাওয়ার কারণে আমার অন্তর জ্বলতেছে, এটা বাস্তবিক পক্ষে মহান আল্লাহর তাকদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন এবং এর হেকমত থেকে উদাসীনতার ফলাফল। হতে পারে একারণে আপনার আরো বড় কোন নেয়ামত হাসিল হবে। যেটা তার হাসিল নেই।

স্বীয় নেয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন

আর এই সব খারাবী এজন্যই সৃষ্টি হয় যেহেতু মানুষ নিজের দিকে তাকানোর পরিবর্তে অন্যের দিকে তাকায়। নিজের যে নেয়ামত হাসিল আছে, সেদিকে কোন ধ্যান খেয়ালই নেই। সেটার উপর আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ের তাওফীক হচ্ছেনা। কিন্তু অন্যের নেয়ামতের দিকে তাকিয়ে আছে।

এমনিভাবে নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য নেই। অন্যের দোষ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। যদি মানুষ তার উপর মহান আল্লাহ সব সময় যে নেয়ামত নাযিল করছেন, সেটার ধ্যান খেয়াল রাখে, তাহলে অন্যের উপর কখনো হিংসা করতে পারে না। তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, এরপরও আল্লাহ পাক তোমাকে নেয়ামতসমূহের এমন বৃষ্টিতে সিক্ত করেছেন আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নেয়ামতের এমন দরিয়ায় ডুবিয়ে রেখেছেন যে, যদি তুমি সেটার কল্পনা করতে থাক, তাহলে অন্যের নেয়ামতের ব্যাপারে তোমার অন্তরে কখনো জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হবে না।

সব সময় নিজের থেকে নিচের মানুষের দিকে দেখবে

বর্তমানে আমাদের সমাজে অন্য মানুষের ব্যাপারে খোঁজ-খবর ও অনুসন্ধানের খুব আগ্রহ দেখা যায়। যেমন অমুকের কাছে টাকা কিভাবে আসে? কোথা হতে আসে? কিভাবে সে বাড়ী বানাচ্ছে? কিভাবে গাড়ী ক্রয় করছে? ইত্যাদি প্রতিটা বিষয়ে সমীক্ষা নেয়ার চিন্তা।

পরবর্তীতে এই অনুসন্ধানের ফলাফল দাঁড়ায় এটাই যে, যদি এমন কোন জিনিস সামনে আসে যেটা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সেটা নিজের কাছে নেই, তাহলে সেটার দ্বারা হিংসা পয়দা হবে না তো কী হবে?

এজন্য ঐ কথাটা মনে রাখবেন যেটা আমি আগেও বলেছি: "দুনিয়ার ব্যাপারে সব সময় নিজের থেকে নিচের মানুষকে দেখবে। আর দ্বীনের ব্যাপারে সব সময় নিজের থেকে উপরের মানুষকে দেখবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এবং শান্তি

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, আমি এক লম্বা সময় পর্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের মহল্লায় ছিলাম এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করতাম। তো ঐ সময় আমার থেকে বেশি বিষণ্ন আর দুঃখী মানুষ কেউ ছিল না। কেননা যার দিকেই তাকাতাম, দেখতাম যে তার কাপড় আমার কাপড় থেকে উন্নত। তার সওয়ারী আমার সওয়ারী থেকে শ্রেষ্ঠ। তার বাড়ী আমার বাড়ী হতে আরো ভালো। ফলশ্রুতিতে সব সময় এই বিষণ্নতায় ভুগতাম যে, তার তো এসব নেয়ামত হাসিল আছে অথচ আমার নেই। এজন্য আমার থেকে বেশি বিষণ্ন মানুষ আর কেউ ছিল না।

কিন্তু পরবর্তীতে আমি এমন মহল্লায় বসবাস আরম্ভ করি যারা দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে দরিদ্র ও নিম্নস্তরের মানুষ। এদের সাথে আমি উঠাবসা আরম্ভ করি। এর ফলে আমি শান্তি পাওয়া আরম্ভ করি। কেননা এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কারণ যার দিকেই তাকাই দেখি যে, আমার পোষাক তার থেকে উন্নত। আমার সওয়ারী তার সওয়ারী অপেক্ষা উত্তম। আমার বাড়ী তার বাড়ী হতে ভালো। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ আমাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেন।

মানুষের চাহিদা কখনোই শেষ হয় না

মনে রাখবেন, কোন মানুষ যদি দুনিয়ার আসবাব জমা করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকে, তো এর কোন সীমা পরিসীমা নেই। কবি বলেন:

کار دنیا کسے تمام نہ کرد

অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ কেউ শেষ করে যেতে পারেনি।

এই পৃথিবীতে যিনি সবচেয়ে বেশি ধনী মানুষ, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আপনি কি সবকিছু পেয়েছেন? আপনার কি আর কোন চাওয়া পাওয়া আছে? দেখবেন উত্তরে তিনি এটাই বলবেন যে, আমার তো আরো অনেক কিছু দরকার। অর্থাৎ তারই ফিকির এটাই যে, আমার সম্পদ আরো বাড়ানো দরকার।

আরবী ভাষার বিখ্যাত কবি মুতানাব্বী দুনিয়ার ব্যাপারে দারুণ জ্ঞানগর্ভ একটি কবিতা বলেছেন। সেটা এই–

وَمَا قَضٰى أَحَدٌ مِّنْهَا لَبَانَتَه

وَلَا انْتَهٰى أَرَبٌ إِلَّا إِلٰى أَرَبٍ

অর্থাৎ এ দুনিয়া হতে আজ পর্যন্ত কারো পেট ভরেনি। যখনই কেউ কোন চাহিদা পূরণ করবে, তখনই আরেকটি চাহিদা সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রত্যেক চাহিদা নতুন চাহিদার জন্ম দেয় এবং প্রত্যেক প্রয়োজন এক নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি করে।

এটা আল্লাহ তাআলার বণ্টন

কোন্ পর্যন্ত হিংসা করবেন? অন্যের নেয়ামতসমূহের উপর বিষণ্ন থাকবেন? কেননা এমনটি তো হবেই। কেউ না কেউ নেয়ামতের দিক দিয়ে আপনার চেয়ে অগ্রসর দেখা যাবে। এজন্য সব থেকে বেশি এটা চিন্তা করা দরকার যে, এটা মহান আল্লাহর বণ্টন। আর আল্লাহ তাআলা এসব জিনিস আপন হেকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী বণ্টন করেছেন। এই হেকমত আপনি বুঝতেও পারবেন না। কেননা আমরা অত্যন্ত সীমিত সীমারেখা নিয়ে চিন্তা করি। আমাদের আকল সীমিত, সীমিত আমাদের চিন্তার পরিধি, এই সীমিত বৃত্তের মধ্যেই আমরা চিন্তা-ভাবনা করি অথচ এর বিপরীতে মহান আল্লাহ আপন অসীম হেকমত দিয়ে পুরো জগতকে বেষ্টন করে আছেন। এই ফয়সালা তিনিই করেন যে, কাকে কী দিবেন? কতটুকু দিবেন? কাকে কোন্টা দিবেন না।

ব্যস এভাবে চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ হিংসা বা পরশ্রীকাতরতার বদস্বভাব দূর হয়ে যাবে।

হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা

এই হিংসা ব্যাধির আরেকটি কার্যকরী চিকিৎসা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, হিংসাকারী এটা চিন্তা করবে, যার ব্যাপারে আমি হিংসা করছি যে, তার থেকে ঐ নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হোক। কিন্তু ব্যাপার সব সময় বিপরীতটাই ঘটে। ফলশ্রুতিতে যার ব্যাপারে হিংসা করা হয়, তার তো উপকার অবশ্যই হয়। দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। পক্ষান্তরে হিংসুক ব্যক্তির শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি।

যার ব্যাপারে হিংসা করা হয়, তার দুনিয়ার ফায়েদা এই যে, যখন তুমি দুনিয়াতে তাকে শত্রু বানিয়ে নিয়েছ তো মূলনীতি এটাই যে, শত্রুর কামনা এটাই থাকে যে, আমার শত্রু সব সময় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকুক। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি হিংসা করবে, দুঃখ কষ্টে লিপ্ত থাকবে। আর এটা ভেবে সে খুশী হতে থাকবে যে, তুমি দুঃখ কষ্টে পতিত আছ।

এটা তো হল তার দুনিয়াবী ফায়েদা। আর আখেরাতের ফায়েদা হচ্ছে এই যে, তুমি তার সাথে যত হিংসা করবে, ততটুকুই তার আমলনামা নেকীর মধ্যে সংযুক্ত হবে। আর যেহেতু সে মাযলূম এজন্য আখেরাতে তার দারাজাত বুলন্দ হবে। আর হিংসার অনিবার্য পরিণতি এই যে, এই হিংসা মানুষকে পরনিন্দা, দোষচর্চা, চোগলখুরী এবং অসংখ্য গুনাহে উদ্বুদ্ধ করে। যার ফলে খোদ হিংসুক ব্যক্তির নেকীগুলো ঐ মাযলূমের আমলনামায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কেননা যখন তুমি তার গীবত করবে এবং তার জন্য বদ দু'আ করবে, তখন তোমার নেকীগুলো তার আমলনামায় চলে যাবে। যার মানে হল তুমি যতটুকু হিংসা কর, ততটুকুই স্বীয় নেকীসমূহের প্যাকেট প্রস্তুত করে তার কাছে প্রেরণ করছ। যদ্দরূন তার উপকার হচ্ছে।

এখন এই হিংসুক যদি সারাজীবন হিংসা করে, তবে তার সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাবে। আর ঐ মাযলূমের আমলনামা সমৃদ্ধ হবে।

এক বুযুর্গের ঘটনা

কিতাবের মধ্যে জনৈক বুযুর্গের ঘটনা লেখা হয়েছে যে, একবার এক ব্যক্তি ঐ বুযুর্গের কাছে এসে বলল যে, হযরত! অমুক মানুষ আপনার সমালোচনা করে। এটা শুনে ঐ বুযুর্গ নীরব হয়ে গেলেন। কোন উত্তর দিলেন না। যখন মজলিস খতম হল, তখন তিনি নিজ বাসায় চলে আসলেন এবং যে লোকটি তাঁর সমালোচনা করছিল তার জন্য বিশাল বড় একটি হাদিয়া প্রস্তুত করে তার বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

লোকেরা বলল, হযরত! সে তো আপনার সমালোচনা করে অথচ তার কাছেই কিনা আপনি হাদিয়া পাঠালেন? বুযুর্গ বললেন: আরে সে তো আমার উপর অনুগ্রহকারী। কেননা সে আমার দোষচর্চা করে আমার নেকী বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই সে তো আমার উপর অনুগ্রহ করেছে। এজন্য আমি তার অনুগ্রহের সামান্য বদলা দিতে চেয়েছি। যেহেতু সে আমার আখেরাতের নেকীসমূহ বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি চাইলাম কমপক্ষে দুনিয়াতেই তাকে সামান্য হাদিয়া দিয়ে দেই।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর গীবত হতে সতর্কতা

আর এটা একটা প্রসিদ্ধ কথা যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মজলিসে কোন ব্যক্তি কারো গীবত করতে পারত না। কেননা তিনি না তো কারো গীবত করতেন আর না কারো গীবত শুনতেন। তাঁর মজলিস সব সময় গীবতমুক্ত হত।

একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজ শিষ্যদের মজলিসে গীবত ও হিংসার ক্ষতি বর্ণনা করেন এবং তাঁদেরকে এটা বুঝানোর জন্য যে, গীবতের দ্বারা নেকীসমূহ নষ্ট হয়ে যায় বলছিলেন যে, এ গীবত এমনই এক জিনিস যা গীবতকারীর নেকীসমূহকে ঐ ব্যক্তির দিকে স্থানান্তরিত করে দেয় যার গীবত করা হয়েছে। এ জন্য আমি কখনো গীবত করিনা। কিন্তু আমার অন্তরে যদি কখনো এই খেয়াল আসে যে, আমি কারো গীবত করব, তো ঐ সময় আমি আমার মা-বাবার গীবত করব। কেননা যদি গীবতের পরিণামে আমার নেকীসমূহ নষ্ট হয়ে যায়, তো

মা বাবার আমলনামায় যাবে। কিন্তু ঘরের জিনিস ঘরে থাকবে। বাইরের কারো কাছে যাবে না।

তো হযরত ইমামে আযম রহ. এদিকে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, এই গীবত ও হিংসাকারী নিজের অন্তরে তো অন্যের ক্ষতি কামনা করছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের উপকার পৌঁছাচ্ছে এবং নিজেই নিজের সর্বনাশ করছে। এজন্য এই গীবত ও হিংসা কতইনা নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর আরেকটি ঘটনা

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সমকালীন বিখ্যাত বুযুর্গ। উভয়ে একই যুগের মানুষ। আর উভয়েরই স্ব স্ব হালকায়ে দরস ছিল।

একদিন হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. এর নিকট কেউ একজন জিজ্ঞেস করল যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? উত্তরে হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বললেন, তিনি খুব কৃপণ মানুষ। তখন ঐ ব্যক্তি বলল যে, আমরা তো তাঁর ব্যাপারে শুনেছি যে, তিনি অত্যন্ত দানশীল মানুষ। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বললেন, তিনি এতই কৃপণ যে, নিজের নেকী কাউকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত নন। অথচ অন্যের নেকীসমূহ তিনি খুব নিতে থাকেন। সেটা এভাবে যে, মানুষ তাঁর খুব গীবত করতে থাকে এবং তাঁর বদনাম করতে থাকে। যদ্দরূন মানুষের নেকীসমূহ তাঁর আমলনামায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে কারো গীবত করেন না এবং শুনেন না। এজন্য স্বীয় নেকীসমূহ কাউকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত নন। এ কারণেই আখেরাত এর দৃষ্টিকোণে তাঁর থেকে অধিক কৃপণ মানুষ আর কেউ নেই।

যার সাথে হিংসা করা হয় অথবা যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয় অথবা যার গীবত করা হয় আসলে সত্য কথা হল হিংসুক এবং গীবতকারী নিজ নেকীসমূহের প্যাকেট বানিয়ে বানিয়ে ঐ ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করছে আর নিজেই রিক্তহস্ত হয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি কে?

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আচ্ছা বলতো নিঃস্ব কোন্ ব্যক্তি? সাহাবায়ে কিরাম রাযি. আরয করলেন, নিঃস্ব তো হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে টাকা-পয়সা নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এ লোক প্রকৃত নিঃস্ব নয়। বরং প্রকৃত নিঃস্ব হল ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় আমলনামায় প্রচুর নেকী, অসংখ্য নামায ও রোযা, অনেক যিকির আযকার ও তাসবীহাত নিয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিবে। কিন্তু যখন কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট হিসাব কিতাবের জন্য হাযির হবে, তখন সেখানে মানুষের ভীড় লেগে যাবে। একজন বলবে: এই লোক আমার ঐ হক নষ্ট করেছিল। আরেকজন বলবে: সে আমাকে অমুক পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। এভাবে তৃতীয়জন, চতুর্থজন।

এখন আখেরাতের কারেন্সী এই নোট তো আর হবে না যে, সেগুলো দিয়ে হক পুরো করে দিবে। সেখানের কারেন্সী হল নেকীসমূহ। তাইতো আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন যে, ঐসব মানুষের হকসমূহের বদলায় এ লোকের নেকীগুলো দিয়ে দেয়া হোক।

এখন কেউ তার নামায নিয়ে চলে যাবে, কেউ নিয়ে যাবে রোযা, কেউ নিয়ে যাবে তার যিকর আযকার। এভাবে তার সমস্ত নেকী খতম হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের হক পুরা হবে না। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ বলবেন: যখন তার নেকীসমূহ শেষ হয়ে গেছে, তো হকওয়ালা বা পাওনাদারদের গুনাহগুলো তার আমলনামায় দিয়ে তাদের হকসমূহ আদায় করো।

পরিণতি হল এটাই যে, যখন সে এসেছিল, তখন তার আমলনামা নেকীর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আর যখন ফেরত যাচ্ছে, তখন শুধু এতটুকু নয় যে, হাতখালী বরং গুনাহের বোঝা নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছে। এই লোকটাই হল প্রকৃত নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত ব্যক্তি।[৬৫]

---

৬৫. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৫৩৩

যাই হোক, হিংসার দ্বারা এভাবে নেকীসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়।

যদি আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কাউকে আয়নার মত স্বচ্ছ একটি অন্তর দান করেন, যার মধ্যে না আছে হিংসা, না আছে বিদ্বেষ, বা কারো প্রতি গীবত। তো এমতাবস্থায় যদি তার আমলনামায় অনেক বেশি নফল এবং অনেক বেশি যিকর-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল নাও থাকে কিন্তু তার অন্তরটা আয়নার মত পরিস্কার হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা এত বেশি বাড়িয়ে দেন যার কোন সীমা পরিসীমা নেই।

জান্নাতের সুসংবাদ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন: একবার আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন যে ব্যক্তি মসজিদের ঐপাশ দিয়ে প্রবেশ করবে সে জান্নাতী। আমরা ঐদিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তো কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এমনভাবে প্রবেশ করলেন যে, তার চেহারা হতে উযূর পানি টপকাচ্ছিল। আর তিনি বাম হাতে জুতা বহন করছিলেন। তাঁর ব্যাপারে আমাদের দারুণ ঈর্ষা হল। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, যখন মজলিস খতম হল, তখন আমার অন্তরে খেয়াল আসল যে, আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখব যে, তাঁর কোন্ আমলটি এমন যেটার ভিত্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত গুরুত্বের সাথে তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

ফলশ্রুতিতে যখন তিনি নিজ বাসায় যেতে উদ্যত হলেন, তখন আমিও তাঁর পিছে পিছে চলতে লাগলাম আর রাস্তায় তাঁকে বললাম যে, আমি দুই তিন দিন আপনার বাসায় থাকার অনুমতি চাই। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমি তাঁর ঘরে চলে গেলাম। যখন রাত হল

এবং তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, তখন আমি সারারাত বিছানায় শুয়ে জেগে থাকলাম। ঘুমালাম না, এটা দেখার জন্য যে, রাত্রে তিনি ঘুম থেকে উঠে কী আমল করেন? কিন্তু সারা রাত পার হয়ে গেল। তিনি ঘুম ছেড়ে উঠলেনই না। পড়ে পড়ে ঘুমালেন। তাহাজ্জুদের নামাযও পড়লেন না। ফজরের সময় উঠলেন। এরপর দিনেও আমি তাঁর কাছে কাটালাম। তো দেখলাম যে, পুরো দিনেও তিনি বিশেষ কোন আমল করেননি। না নফল, না যিকর আযকার, না তাসবীহ, না তিলাওয়াত। ব্যস যখন নামাযের সময় হত, তখন মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে নিতেন। যখন দুই তিনদিন আমি সেখানে থেকে দেখে নিলাম যে, ইনিতো বিশেষ কোন আমলই করেন না। শুধু ফরয ওয়াজিবগুলো যথাযথভাবে আদায় করেন আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন। তখন তিনি বললেন যে, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এ সুসংবাদ দিয়ে থাকেন তবে সেটা আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমার দ্বারা তো কোন আমল হয় না। আর আমি নফল নামাযও বেশি পড়তে পারিনা। কিন্তু একটা কথা। সেটা হল আমার অন্তরে কারো ব্যাপারে কোন হিংসা বা বিদ্বেষ নেই। সম্ভবত এ কারণে মহান আল্লাহ আমাকে এ সুসংবাদের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন।[৬৬]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, এ মহা সৌভাগ্যবান মানুষটি ছিলেন হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি.। যিনি আশারায়ে মুবাশশারাহ তথা পৃথিবীর বুকেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে একজন।

তার উপকার, আমার ক্ষতি

যাই হোক, আপনি দেখলেন যে, এসব আমলের মধ্যে খুব বেশি নফল, যিকর-আযকার কিন্তু নেই। কিন্তু অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত। দিল আয়নার মত স্বচ্ছ। তো হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা হল এই যে, মানুষ এটা চিন্তা করবে যে, আমি যার সাথে হিংসা করছি, এই হিংসার

৬৬. শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৬১৮৩

ফলে তার তো উপকার হবে, কিন্তু আমার তো ক্ষতি। এভাবে চিন্তা করলেও এ ব্যাধি হ্রাস পায়।

হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা

যেমনটি আমি আরয করেছি যে, হিংসার ভিত্তি হল দুনিয়ার মহব্বত ও পদের মোহ। এজন্য এই হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা হল, মানুষ নিজের অন্তর হতে দুনিয়া ও পদের মোহ বের করার চিন্তা করবে। কেননা সমস্ত ব্যাধির মূল হল দুনিয়ার মহব্বত। আর এই দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে বের করার পদ্ধতি হল, মানুষ এটা চিন্তা করবে যে, দুনিয়া কয়দিনের? যে কোন সময় চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের মুক্তির কোন পথ থাকবে না। দুনিয়ার স্বাদ, দুনিয়ার নেয়ামত, এর সম্পদ, এর সুখ্যাতি ও সম্মান এবং এসবের অস্থায়ীত্বের ব্যাপারে মানুষের চিন্তা করা উচিত। আর ভাবা উচিত যে, যে কোন সময় মৃত্যু চলে আসবে তো সমস্ত কাহিনী খতম হয়ে যাবে।

যাই হোক, এ তিনটি জিনিস যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং এগুলো মনের মধ্যে হাযির থাকলে এই ব্যাধি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হিংসা দু'প্রকার

আরেকটি কথা বুঝে নিন। এটা বুঝা খুব জরুরী। সেটা হচ্ছে এই যে, হিংসার খারাবীসমূহ শোনার পর অনেক সময় মনের মধ্যে এমন খেয়াল আসে যে, এই ব্যাধিটাতো এমন যে, অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেও এটা সৃষ্টি হয়ে যায়। বিশেষত আমরা আমাদের সমবয়সী, সমমর্যাদাবান, সহপাঠী বা সহপেশার লোকদের মধ্যে কাউকে অগ্রসর বা উন্নতি করতে দেখলে গাইরে ইখতিয়ারীভাবে অন্তরে এই খেয়াল আসে যে, আচ্ছা এতো আমার থেকে আগে বেড়ে গেল। অতঃপর অন্তরে অবচেতন ভাবেই একটা বেদনা ও বিষণ্নতার ভাব চলে আসে।

এখন ব্যাপার হল, এটার তো ইচ্ছা ছিলনা বা নিজ ইখতিয়ারেও অন্তরে আনা হয়নি। বরং গাইরে ইখতিয়ারী বা অবচেতনভাবে মনে খেয়াল এসে গেছে। এর থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে? এর থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি কি?

খুব বুঝে নিন। হিংসার একটা পর্যায় তো হল কোন মানুষের অন্তরে এই খেয়াল আসল যে, অমুক ব্যক্তি যে নেয়ামত পেয়েছে সেটা যেন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু এই খেয়ালের পাশাপাশি হিংসাকারী নিজের কথা ও কাজের দ্বারা তার অমঙ্গলও কামনা করে। উদাহরণস্বরূপ মজলিসে বসে তার দোষচর্চা করে, তার গীবত করে, যাতে করে ঐ নেয়ামতের কারণে মানুষের অন্তরে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা শেষ হয়ে যায়। অথবা সে এই চেষ্টা করছে যেন তার থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়।

এমন হিংসা সম্পূর্ণ হারাম। এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, অন্যের নেয়ামত দেখে তার অন্তরে কষ্ট লাগে। আর এই খেয়াল আসে যে, সে এই নেয়ামত কেন পেল? কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিজ কথা বা কাজ, আচার-আচরণ দ্বারা এই হিংসার ব্যাপারটা অন্যের সামনে প্রকাশ করে না। ঐ লোকের সমালোচনা বা গীবতও করে না। তার অমঙ্গলও কামনা করে না আর তার থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার কোন অপচেষ্টাও সে চালায়না। ব্যস অন্তরে শুধু একটি দুঃখ ও ব্যথা যে, সে এই নেয়ামত কেন পেল?

বাস্তবিক পক্ষে তো এটাও হিংসা ও গুনাহ। কিন্তু এর চিকিৎসা সহজ। আর সামান্য মনোযোগী হলে এই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার করবে

এর চিকিৎসা হল, যখন অন্তরে এই জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে একথা চিন্তা করবে যে, এই হিংসা কত মারাত্মক জিনিস। আর আমার অন্তরে এই যে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হচ্ছে, এটা খুবই খারাপ কাজ। আর যখন এ জাতীয় খেয়াল অন্তরে আসে, সঙ্গে

সঙ্গে ইসতিগফার পড়বে আর এটা চিন্তা করবে যে, নফস ও শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করছে। এটা আমার জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার। এজন্য যখনই হিংসার খেয়াল আসে, তখনই হিংসার ধ্বংসলীলার খেয়ালও অন্তরে নিয়ে আসবে। তাহলে এই হিংসার গুনাহ খতম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তার ব্যাপারে দু'আ করবে

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন যে, যদি অন্তরে অন্যের নেয়ামত দেখে হিংসা ও জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়, তাহলে এটার একটি চিকিৎসা এটাও আছে যে, নির্জনে বসে মহান আল্লাহর কাছে তার ব্যাপারে দু'আ করবে "হে আল্লাহ! এই যে নেয়ামত আপনি তাকে দান করেছেন আরো বাড়িয়ে দিন। যে সময় সে দু'আ করবে তখন তো তার অন্তরে করাত চলবে। আর এই দু'আর দ্বারা অন্তরে প্রচন্ড চাপ পড়বে। কিন্তু তারপরও ইচ্ছার বিপরীত মনের উপর চাপ প্রয়োগ করে দু'আ করবে। হে আল্লাহ! আপনি তাকে আরো উন্নতি দান করুন। তার নেয়ামতে আরো বরকত দান করুন।

আর এর পাশাপাশি নিজের জন্যও এই দু'আ করবে যে, ইয়া আল্লাহ! আমার অন্তরে তার নেয়ামতের কারণে যে কষ্ট ও জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে নিজ অনুগ্রহে সেটা দূর করে দিন।

সারকথা হল এই তিনটি কাজ করবে। একটি হল নিজ অন্তরে যে কষ্ট পয়দা হচ্ছে আর তার নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার যে খেয়াল অন্তরে জাগছে সেটাকে অন্তর থেকেই খারাপ মনে করবে। দ্বিতীয়ত তার জন্য কল্যাণের দু'আ করবে। তৃতীয়ত নিজের জন্য দু'আ করবে, "হে আল্লাহ! আমার দিল হতে এটা দূর করে দিন।"

এই তিনটি কাজ করার পরও যদি অন্তরে অবচেতনভাবে খারাপ খেয়াল আসে, তাহলে আশা করা যায় যে, মহান আল্লাহর শাহী দরবারে পাকড়াও হবে না। ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি অন্তরে খারাপ খেয়াল আসতেই থাকে অথচ সে এই খেয়ালকে খারাপ মনে করে না

অথবা সেটা থেকে পরিত্রাণ লাভের ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করে না, তাহলে কিন্তু গুনাহ হবে।

হক নষ্ট করার ব্যাখ্যা

এ মাসআলাটি আমি বহুবার বলেছি যে, যে সব গুনাহের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হকের সাথে, ঐসব গুনাহের চিকিৎসা তো সহজ যে, মানুষ তাওবা ও ইসতিগফার করে নিবে। ঐ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যেসব ত্রুটি ও গুনাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে, সেগুলো শুধুমাত্র তাওবা করার দ্বারা মাফ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত হকওয়ালা মাফ না করে বা তার দ্বারা মাফ করানো না হবে। ঐ সময় পর্যন্ত মাফ হবে না।

হিংসার ব্যাপার হল এই যে, যদি এটাকে আপনি আপনার মুখে নিয়ে আসেন আর ঐ হিংসার বশবর্তী হয়ে আপনি গীবত করে বসেন অথবা তার অমঙ্গল কামনায় কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন, তাহলে এমতাবস্থায় হিংসার সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে হয়ে যাবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মাফ না করবে, এই গুনাহ মাফ হবে না।

কিন্তু যদি হিংসা শুধু অন্তরেই থাকে, মুখে তার সমালোচনায় বা গীবত হিসেবে কিছু না বলে এবং তার নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ হিংসার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হকের সাথে। এ কারণে ঐ গুনাহটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাফ চাওয়া ব্যতীত শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে।

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত হিংসা অন্তরে আছে, মানুষ চিন্তা করবে যে, এখনো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণে আছে। সহজভাবে এর সমাধান হতে পারে। আর মাফ চাওয়াও সহজ। নতুবা যদি এটা আগে বেড়ে যায়। তাহলে বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। পরে আর মাফের কোন পথ থাকবে না।

অধিক ঈর্ষা করাও ভাল নয়

যেমনটি আমি আরয করেছি যে, যদি অন্যের নেয়ামত ছিনতাই হওয়ার ইচ্ছা অন্তরে না থাকে বরং শুধু এই খেয়াল হয় যে, এ নেয়ামত আমারও হাসিল হোক। তো যদিও এটা হিংসা নয় বরং ঈর্ষা। কিন্তু এটা বেশি বেশি মনে আনা ও চিন্তা করা শেষ পর্যন্ত মানুষকে হিংসা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

এজন্য যদি দুনিয়ার মাল দৌলতের কারণে কারো উপর ঈর্ষা চলে আসে, তাহলে এটাও কোন ভাল কথা নয়। কেননা এই ঈর্ষাই অনেক সময় অন্তরে মাল দৌলতের লোভ সৃষ্টি করে দেয়। আবার অনেক সময় এই ঈর্ষা সামনে অগ্রসর হয়ে হিংসায় পরিণত হয়।

দ্বীনের কারণে ঈর্ষা করা ভালো

কিন্তু যদি দ্বীনদারীর কারণে ঈর্ষা সৃষ্টি হয় তো এটা তো ভালো কথা। কেননা হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন−

لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

অর্থাৎ “হিংসা জায়িয নেই কিন্তু শুধুমাত্র দু’জন মানুষের ক্ষেত্রে জায়িয। (এখানে “হিংসা” দ্বারা “ঈর্ষা” উদ্দেশ্য) একজন হলেন ঐ মানুষ যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন আর তিনি সেটাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। আর অপরজন হলেন ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন আর তিনি ঐ ইলমের মাধ্যমে মানুষদেরকে উপকার পৌঁছাচ্ছেন ও দ্বীনের শিক্ষা দিচ্ছেন।”[৬৭]

এজন্য যদি দ্বীনের কারণে কেউ ঈর্ষা করে যে, অমুক ব্যক্তি দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে আমার থেকেও আগে বেড়ে গেছে। তাহলে সেই ঈর্ষা পছন্দনীয় এবং খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার।

---

৬৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৭৩

দুনিয়ার জন্য ঈর্ষা পছন্দনীয় নয়

কিন্তু দুনিয়ার মাল দৌলতের কারণে অন্যের উপর ঈর্ষা করা যে, অমুকের কাছে সম্পদ বেশি আছে, দৌলত বেশি আছে, তার প্রসিদ্ধি বেশি, সম্মান বেশি, এসব দুনিয়াবী জিনিসেও ঈর্ষা করা পছন্দনীয় নয়। কেননা এসব জিনিসে বেশি সন্দেহের কারণে লোভ সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে হিংসা পয়দা হওয়ারও আশংকা আছে। এজন্য এই ঈর্ষাকেও বেশি বাড়তে দেয়া যাবে না। বরং যখন এ জাতীয় খেয়াল মনের মধ্যে আসবে, তখন মানুষ চিন্তা করবে যে, যদি অমুক নেয়ামত তার কাছে থেকে থাকে তাহলে কী অসুবিধা? আল্লাহ পাক তো আমাকেও অনেক নেয়ামত দান করেছেন। যা তার কাছে নেই। আর যে সব নেয়ামত আমি পাইনি, নিশ্চয়ই সেগুলো না পাওয়ার মধ্যেই আমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে। ঐসব নেয়ামত আমার কাছে থাকলে না জানি কোন্ মুসীবতে আমি ফেঁসে যেতাম।

যাই হোক, এসব কথা চিন্তা করবে এবং এই ঈর্ষার খেয়াল কেও নিজ অন্তর হতে বের করার চেষ্টা করবে। হিংসার ব্যাপারে এ কয়টা কথা আমি আপনাদের খেদমতে আরয করলাম।

আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে আমাদেরকে এর বাস্তবতা অনুধাবন করার তাউফীক দান করুন এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাঁচার তাউফীক দান করুন। আমীন।

শাইখ এবং মুরব্বীর প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু যেমনটি আমি বারবার আরয করতে থাকি যে, অন্তরের যতগুলো রোগ আছে, সেগুলো থেকে বাঁচার প্রকৃত চিকিৎসা হল এই যে, কোন রূহানী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে।

যদি শারীরিক রোগের কোন ডাক্তার একবার রোগীকে নিজের কাছে বসিয়ে খুব ভালভাবে এটা বলে দেয় যে, জ্বরের হাকীকত কি? এর বাস্তবতা কি? এর কারণ বা উপলক্ষই বা কি কি? এর চিকিৎসা ও ঔষধসমূহ কি কি? ইত্যাদি। কিন্তু যখন তার জ্বর আসবে তখন কি সে

ডাক্তার সাহেবের বাতলানো কথাগুলোকে স্মরণ করে সে অনুযায়ী নিজের চিকিৎসা নিজেই আরম্ভ করবে? বলা বাহুল্য যে, সে এমনটি করবে না। কেননা অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অনেক সময় ঔষধসমূহ নিজের জন্য ফিট করার ক্ষেত্রে ভুলও হয়ে যায়। এজন্য কোন ডাক্তার বা চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

অনুরূপভাবে অন্তরের যে ব্যাধিগুলো আছে, উদাহরণস্বরূপ রিয়াকারী বা মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করা হিংসা বা বিদ্বেষ, তাকাব্বুর বা অহংকার ইত্যাদি। আপনারা এগুলোর বাস্তবতা তো শুনে ফেলেছেন। কিন্তু যখন কেউ এ জাতীয় কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে, তখন তার উচিত হবে এমন কোন রূহানী ডাক্তার বা আত্মার রোগের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া, যিনি নিজের চিকিৎসা করিয়েছেন এবং অন্যের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে পারদর্শী ব্যক্তি। তাকে বলতে হবে যে, হযরত! আমার অন্তরে বিভিন্ন খারাপ খেয়াল ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। এর সমাধান কি? এরপর ঐ বুযুর্গ সঠিক ব্যবস্থাপত্র দেন।

অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ নিজেকে রোগী মনে করে, কিন্তু বাস্তবে সে রোগী নয়। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ নিজেকে সুস্থ মনে করে কিন্তু বাস্তবে সে হল অসুস্থ। আবার অনেক সময় এমন হয় যে, তার জন্য কোন চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপত্র উপকারী কিন্তু দেখা যায় যে, সে অন্য কোন চিকিৎসা গ্রহণ করছে!!

এজন্য বুনিয়াদী কথা হল এই যে, কোন অনুমতিপ্রাপ্ত আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের কাছে রুজু করে তাঁকে নিজের ভেতরগত অবস্থা বিস্তারিত জানাবে। অতঃপর তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপত্র বা চিকিৎসা অনুযায়ী আমল করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

غصّے کو قابو میں کیجئے

গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন

بسم الله الرحمن الرحيم

বাদ হামদ ও সালাত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِيْ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ قَالَ: لَا تَغْضَبْ.

“হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন উপদেশ দিন তবে লম্বা উপদেশ দিবেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: গোস্বা করবে না।”[৬৮]

আগন্তুক সাহাবী উপদেশ প্রদানের দরখাস্ত করেছেন। পাশাপাশি শর্ত আরোপ করেছেন যেন ঐ উপদেশ সংক্ষিপ্ত হয়। লম্বা চওড়া না হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ শর্তের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি যে, উপদেশ চাও আবার সংক্ষেপ করতে বল। এ কারণেই এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম লিখেছেন: যে ব্যক্তি উপদেশপ্রার্থী, সে যদি একথা বলে যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করুন। তাহলে সেটা আদব পরিপন্থী হবে না। কারণ হতে পারে সে মানুষটির তাড়াহুড়ো আছে। যদ্দরুন তিনি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করছেন। এখন যদি আপনি তার সামনে লম্বা উপদেশ প্রদান শুরু করেন, তাহলে ঐ বেচারা পেরেশানীতে পড়ে যাবে।

---

৬৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১১৬

তো যাই হোক, এটা আদব পরিপন্থী কোন কাজ নয়। তাইতো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করে বলেছেন: لَا تَغْضَبْ "তুমি গোস্বা করো না"।

যদি মানুষ এই সংক্ষিপ্ত উপদেশের উপর আমল করে তাহলে সম্ভবত শত সহস্র গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

গুনাহের দু'টি উপলক্ষ: গোস্বা ও কু-প্রবৃত্তি

কেননা দুনিয়াতে যত গুনাহ হয় চাই সেটা মহান আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট হোক বা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হোক। মানুষ চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, এসব গুনাহের নেপথ্যে দু'টি স্পৃহা কাজ করে। একটি হল "গোস্বা"। আর অপরটি হল خواهش نفس বা মনের মন্দবাসনা। উদাহরণস্বরূপ: বেশি খাওয়ার বাসনা, চুরি করার বাসনা, বারবার গুনাহ করার বাসনা, ডাকাতি করার বাসনা, কুদৃষ্টি করার বাসনা ইত্যাদি।

বুঝা গেল যে, অনেক গুনাহ মানুষ করে মনের মন্দ বাসনার তাড়নায় তাড়িত হয়ে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, অসংখ্য গুনাহ আছে যেগুলো মন্দ বাসনার তাড়নায় সৃষ্টি হয়। আবার অনেক গুনাহ আছে যেগুলো গোস্বার দ্বারা পয়দা হয়। এখনই আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এর দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এই গোস্বা কত বড় বড় গুনাহের জনক। কাজেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যে কথাটি বললেন, "গোস্বা করো না" যদি মানুষ এই একটি উপদেশের উপর আমল করে, তো এর ফলে অর্ধেক গুনাহ খতম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আত্মশুদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলেন: এই হাদীসের বিষয়বস্তু অর্থাৎ গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সুলূক ও তরীকতের এক বিশাল অধ্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলতে চায় এবং নিজের সংশোধন করতে চায়, তার প্রথম করণীয় কাজ হল গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ফিকির করা।

"গোস্বা" একটি প্রকৃতিগত জিনিস

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই "গোস্বা" বা রাগ রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর কোন মানুষ এমন নাই যার মধ্যে গোস্বার প্রকৃতি নাই। মহান আল্লাহ নিজ হেকমতের কারণেই এই প্রকৃতি ও স্বভাব মানুষের মধ্যে রেখেছেন। এই স্বভাবটাকেই যদি মানুষ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তাহলে এটাই মানুষকে অগণিত বালা-মুসীবত থেকে সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম হয়ে যায়।

যদি মানুষের মধ্যে এই রাগের স্বভাব না থাকে, তাহলে কোন শত্রু যদি তার উপর আক্রমণ করে তবুও তার রাগ বা গোস্বাও আসবে না। অথবা কোন হিংস্র প্রাণী তার উপর হামলা করলেও তার কোন গোস্বাই আসবে না। এমনকি সে আত্মরক্ষাও করতে পারবে না। এজন্য বৈধ আত্মরক্ষার জন্য গোস্বার ব্যবহার জায়িয আছে। শরীয়ত এ ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেনি। কেননা গোস্বা তো দেয়াই হয়েছে এজন্য যেন সে মানুষ স্বীয় জান-মাল হেফাযত করতে পারে। নিজ স্ত্রী-সন্তানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে প্রতিহত করতে পারে। এগুলো হল গোস্বার বৈধ ক্ষেত্রসমূহ।

গোস্বার ফলে সৃষ্ট গুনাহসমূহ

কিন্তু যদি এই গোস্বাই নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তাহলে এর পরিণামে যে গুনাহ সৃষ্টি হয় সেগুলোর সংখ্যা অনেক।

তাইতো গোস্বার দ্বারাই "অহংকার" সৃষ্টি হয়, গোস্বার কারণেই "হিংসা" সৃষ্টি হয়। গোস্বার ফলেই "বিদ্বেষ" সৃষ্টি হয়, গোস্বার দরূনই "শত্রুতা" সৃষ্টি হয়। এগুলো ছাড়াও না জানি কত খারাবী এই গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়। যদি এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে না থাকে, উদাহরণস্বরূপ যদি গোস্বা কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণে না থাকে আর সেই গোস্বা কোন মানুষের উপর এসে যায়, এখন যার উপর গোস্বা এসেছে সে নিয়ন্ত্রণে আছে। উদাহরণস্বরূপ সে অধীনস্ত, তাহলে এই গোস্বার ফলে হয়ত

তাকে কষ্ট দিবে অথবা মারবে অথবা ধমক দিবে কিংবা গালি দিবে বা সমালোচনা করবে বা মনে ব্যথা দিবে ইত্যাদি।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই প্রত্যেকটি কাজ গুনাহ। যা গোস্বার ফলে তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কেননা অন্যকে অন্যায়ভাবে মারপিট করা মারাত্মক গুনাহ। অনুরূপভাবে যদি গোস্বার কারণে কাউকে গালি দিয়ে দেয়। তো হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهُ كُفْرٌ অর্থাৎ "কোন মুসলমানকে গালি দেয়া নিকৃষ্টতম ফাসেকী কাজ, আর তাকে হত্যা করা কুফরী কাজ।"[৬৯]

অনুরূপভাবে যদি গোস্বার কারণে অন্যের সমালোচনা বা নিন্দাবাদ করে, যদ্দরুন অন্য মানুষের অন্তর ভেঙ্গে যায়, তাহলে এটাও অনেক বড় গুনাহ। এই সব গুনাহ ঐ সময় হয়েছে যখন এমন ব্যক্তির উপর গোস্বা এসেছে যিনি আপনার অধীনস্ত ছিলেন।

"বিদ্বেষ" গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়

আর যদি এমন কারো উপর গোস্বা এসে যায় যিনি আপনার অধীনস্ত নন এবং তিনি আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই, তাহলে তো গোস্বার ফলে আপনি তার গীবত করবেন। উদাহরণস্বরূপ যার উপর গোস্বা এসেছে তিনি আপনার থেকে যে কোন দিক দিয়ে বড় এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তার সামনে কিছু বলার সাহস আপনার নেই, মুখ খুলেনা। ফলশ্রুতিতে যেটা হবে সেটা হল আপনি তার সামনে তো চুপ থাকবেন ঠিক, কিন্তু যখন তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবেন, তখন তার বদনাম গাওয়া আরম্ভ করে দিবেন। আর তার গীবত করতে থাকবেন।

এখন এই যে গীবত হচ্ছে কিসের কারণে হচ্ছে? ঐ গোস্বার কারণে। আবার অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ অন্যের যত গীবতই করুক, তবুও তার গোস্বা ঠান্ডা হয় না বরং গোস্বার কারণে মনে চায় যে, তার চেহারা খামচে ধরি। তাকে কষ্ট দেই। কিন্তু যেহেতু সে

৬৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮

প্রভাবশালী ও বড়, এজন্য তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। এর ফলে অন্তরে এক মারাত্মক ক্ষোভ জন্ম নেয়। সেই ক্ষোভের নামই হল "বিদ্বেষ"।

এখন মনের মধ্যে সব সময় এ চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, যদি সুযোগ হয়, তাহলে তাকে কষ্ট দিব। আর যদি আপনা আপনি তার কোন বিপদ আসে তাহলে খুশী হয় যে, ভালই হয়েছে যে, তার কষ্ট হচ্ছে, বিপদ এসেছে। এটাই "বিদ্বেষ"। যা স্বতন্ত্র একটি গুনাহ। যা ঐ গোস্বার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

"হিংসা" গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয়

আর যদি যে ব্যক্তির উপর গোস্বা আসবে তার কষ্ট পাওয়ার পরিবর্তে আরাম ও খুশী হাসিল হয়ে যায়। যেমন কোন স্থান হতে সে মোটা অংকের টাকা পেয়ে গেল অথবা সে কোন বড় পদমর্যাদার অধিকারী হয়ে গেল, তো এখন অন্তরে এই চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে যে, এই পদমর্যাদা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক। এই ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা যে কোন ভাবেই যেন তার কাছে নষ্ট হয়ে যায়। এটার নামই হল "হিংসা"। এই "হিংসাও" ঐ গোস্বার ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে।

যাই হোক, যার উপর গোস্বা আসছে যদি তার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলেও অনেক গুনাহ এর দ্বারা প্রকাশ পায়, আর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবুও অনেক গুনাহ প্রকাশ পায়। এই সব গুনাহ ঐ "গোস্বা" নিয়ন্ত্রণে না থাকার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে। যদি গোস্বা নিয়ন্ত্রণে থাকত, তাহলে মানুষ এই সব গুনাহ হতে নিরাপদ থাকত। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন لَا تَغْضَبْ "গোস্বা করোনা"।

তাইতো কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নেক মুসলমানদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ

অর্থাৎ "নেক মুসলমান হলেন তারা যারা গোস্বাকে সংবরণ করেন আর মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেন।"[৭০]

---

৭০. সূরা আলে ইমরান: ১৩৪

গোস্বার ফলে বান্দার হকসমূহ নষ্ট হয়

যেমনটি আমি আরয করেছি যে, গুনাহের উৎসমূল হল দুটি জিনিস। একটি হল গোস্বা। অপরটি হল মনের মন্দ বাসনা। কিন্তু মন্দ বাসনার তাড়নায় যে গুনাহ সংঘটিত হয়, সেটা যদিও বড় মারাত্মক কিন্তু সেই গুনাহও খালেস দিলে তাওবা করলে মহান আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন এবং তার তাওবা কবূল করে নেন। শুধু তাই নয় বরং তার আমলনামা হতে ঐ গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।

কিন্তু গোস্বার ফলে যে গুনাহ সংঘটিত হয়, সেগুলোর বেশিরভাগের সম্পর্ক হল বান্দার হকের সাথে। উদাহরণস্বরূপ গোস্বার ফলে কাউকে মারল বা বকা দিল বা কারো মনে ব্যথা দিল বা কারো সমালোচনা করল ইত্যাদি। এসবের সম্পর্ক হল বান্দার হকের সাথে।

অনুরূপভাবে যদি গোস্বার ফলে কারো গীবত করে অথবা কারো সাথে "বিদ্বেষ" রাখে বা কারো সাথে "হিংসা" সৃষ্টি হয়, তো এ সবও বান্দার হক নষ্ট করা। অতএব গোস্বার ফলে যত গুনাহ হয়, সবগুলোর সম্পর্ক হল বান্দা বা বান্দীর হকের সাথে। আর বান্দার হক নষ্ট করা এমন মারাত্মক একটি গুনাহ যে, যদি পরবর্তীতে মানুষ এর থেকে ফিরেও আসে এবং তাওবা করে নেয়, তবুও তার তাওবা ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যে বান্দার হক নষ্ট করেছে, সে মাফ না করবে। অতক্ষণ পর্যন্ত ঐ গুনাহ মাফ হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন: তাওবা করলে আমি আমার হক তো অবশ্যই মাফ করব কিন্তু আমার বান্দাগণের যে সব হক তোমরা নষ্ট করেছ, সেগুলো আমি অতক্ষণ পর্যন্ত মাফ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বান্দাদের থেকে মাফ করিয়ে না নিবে।

এখন তুমি কার কার কাছে মাফের জন্য ছুটাছুটি করবে? এজন্য বান্দার হক নষ্ট করা বড় মারাত্মক গুনাহ। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভমূলক উপদেশ প্রদান করে বলেছেন: لَا تَغْضَبْ "গোস্বা করবে না"।

যখন মানুষ স্বীয় গোস্বার উপর কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তখন মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন: যখন আমার বান্দা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তো এখন আমিও তার সাথে গোস্বাসুলভ আচরণ করব না।

গোস্বা না করার উপর বিশাল প্রতিদান

একটি হাদীস শরীফের ভাবার্থ এমন, কিয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের জন্য আল্লাহ্ জাল্লাহ শানুহুর সামনে এক ব্যক্তিকে আনা হবে। আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন: বলো এর আমলনামায় কী কী নেকী আছে? অথচ আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু জানেন। কিন্তু অনেক সময় অন্যদের সামনে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ পাক প্রশ্নও করেন।

উত্তরে ফেরেশতাগণ বলবেন যে, ইয়া আল্লাহ! তার আমলনামায় খুব বেশি নেকী তো নেই। সে না তো নফল নামায বেশি পড়েছে আর না তো ইবাদত বেশি করেছে। কিন্তু তার আমলনামায় একটি বিশেষ নেকী এই যে, যখন কোন ব্যক্তি তার সাথে বাড়াবাড়ি করত, তখন সে তাকে মাফ করে দিত। আর যখন কারো কাছে তার টাকা-পয়সা পাওনা হত আর ঐ ব্যক্তি বলত যে, আমার এ মুহূর্তে টাকা পরিশোধ করার মত সামর্থ্য নেই, তখন সে স্বীয় কর্মচারীদেরকে বলত যে, "এ লোকটির এ মুহূর্তে আমার টাকা আদায় করার সামর্থ্য নেই। এজন্য তাকে ছেড়ে দাও।"

এভাবে সে নিজের হক ছেড়ে দিত। মহান আল্লাহ্ এটা শুনে বলবেন যে, যেহেতু এই মানুষটি আমার বান্দাদের সাথে সদাচরণ করত, মাফ করে দিত এবং নিজের হক ছেড়ে দিত, তাই আজ আমিও তার সাথে ক্ষমার আচরণ করব এবং তাকে ক্ষমা করে দিব।

ফলশ্রুতিতে এটার ভিত্তিতে মহান আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন।

শাহ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. এর ছেলের মুজাহাদা

এ কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট যখন কেউ নিজ ইসলাহ বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে যেত, তখন তাওবার পর তাকে এ সবক দেয়া হত যে, স্বীয় গোস্বাকে বিলকুল (সম্পূর্ণ) খতম করে দিবে। আর এই গোস্বাকে খতম করানোর জন্য বড় বড় মুজাহাদা করানো হত।

হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। আর সারা দুনিয়া থেকে মানুষ তাঁর নিকট নিজ ইসলাহের উদ্দেশ্যে আসত। তাঁর ছেলে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কোন মূল্যায়ন করেনি। এমনটি প্রায় হয়ে থাকে যে, যতদিন পর্যন্ত নিজের মুরব্বী হায়াতে থাকেন, তো দিলের মধ্যে তাঁর কোন কদর থাকে না। তাইতো প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে "ঘরের মুরগী ডাল বরাবর"।

পিতা ঘরে বিদ্যমান, সারা দুনিয়া এসে তাঁর থেকে ফয়েয হাসিল করছে। কিন্তু ছেলের এ সবের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সে নিজ খেলাধুলায় মত্ত। যখন পিতার ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন চোখ খুলল। আর এটা চিন্তা করল যে, ঘরের মধ্যে কত বড় দৌলত বিদ্যমান ছিল। সারা দুনিয়া এসে তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে কিন্তু আমি তো সময় নষ্ট করেছি আর তাঁর থেকে কিছুই অর্জন করতে পারিনি। এখন খোঁজ-খবর নিলেন যে, আমার মরহুম পিতার কাছে যাঁরা আসতেন এবং যাঁরা আমার পিতার মাধ্যমে নিজেদের ইসলাহ করিয়েছেন, ইনাদের মধ্যে কে আছেন এমন যিনি আমার আব্বাজান থেকে সবচেয়ে বেশি ফয়েয হাসিল করেছেন। যাতে করে কমপক্ষে আমি তাঁর নিকট গিয়ে ফয়েয হাসিল করতে পারি।

অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, এমন একজন বুযুর্গ বলখে থাকেন। আর ইনি নিজে ইউপি তথা উত্তর প্রদেশের গাঙ্গুহে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তিনি বলখ যাওয়ার নিয়্যত করে ফেলেন এবং শাইখকে জানিয়ে দেন যে, আমি বলখ আসছি।

এই বুযুর্গ যখন সংবাদ পেলেন যে, আমার শাইখের ছেলে আগমন করছেন তখন তিনি খাদেম নফর সহ শহরের বাইরে গিয়ে

তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং খুব ইজ্জত-সম্মান করে বাসায় নিয়ে আসেন। তাঁর জন্য শানদার খানা রান্না করেন, খুব দাওয়াত করেন। এভাবে এক দুই দিন যাওয়ার পর ছাহেবযাদা আরয করলেন যে, হযরত! আপনি আমার সাথে অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেছেন এবং আমার মূল্যায়ন করেছেন কিন্তু আমি মূলত অন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। শাইখ জিজ্ঞেস করলেন সেই উদ্দেশ্য কী? ছাহেবযাদা আরয করলেন, হযরত! আমি তো এ উদ্দেশ্যে এসেছি যে, আমার মরহুম আব্বাজান থেকে যে বাতেনী দৌলত আপনি নিয়ে এসেছেন সেটার কিছু অংশ আপনার থেকে হাসিল করব। কেননা তাঁর জীবদ্দশায় আমি তাঁর থেকে নিতে পারিনি।

শাইখ বললেন, আচ্ছা তুমি এ উদ্দেশ্যে এসেছ। তো এখন থেকে এই খাতির আপ্যায়ন, মেহমানদারী সব বন্ধ থাকবে। এই ইজ্জত ও সম্মান এই দাওয়াতের শানদার খানা সব বন্ধ। এখন তুমি যেটা করবে সেটা হল মসজিদের পাশে একটি হাম্মাম আছে। ঐ হাম্মামের পাশে হবে তোমার ঠিকানা। সেখানেই তোমাকে ঘুমাতে হবে। আর হাম্মামের আগুন জ্বালিয়ে সব সময় সেটার পানি গরম রাখতে হবে, আর সেটার জন্য কাঠ-লাকড়ী সংগ্রহ করে এনে এতে ফুঁক দিবে।

যেহেতু শীত মৌসুম ছিল। নামাযী মানুষদের উযূর জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করা হত। ঐ ছাহেবযাদাকে বলে দিলেন: ব্যস তোমার কাজ স্রেফ এটাই। কোন ওয়াযীফা কোন তাসবীহ ইত্যাদি বলেননি।

কোথায় সেই ইজ্জত-সম্মান! আর কোথায় এই মুজাহাদা ও খেদমত!

অহংকারের চিকিৎসা

যেহেতু ইনি ইখলাসের সাথে নিজের ইসলাহের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, এজন্য শাইখের নির্দেশ পালনার্থে ঐ স্থানে গেলেন এবং ঐ কাজে গেলেন।

এখন একটা লম্বা সময় পর্যন্ত তাঁর দায়িত্বে ব্যস স্রেফ একাজই ছিল যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ও মসজিদ এর হাম্মাম আলোকিত করো।

ঐ বুযুর্গ জানতেন যে, এ ছাহেবযাদাদের মধ্যে বংশীয় আভিজাত্য থাকলেও অন্তর থাকে পবিত্র। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটা দোষ অবশ্যই থাকে। আর সেটা হল অহংকার ও দাম্ভিকতা। এটার চিকিৎসা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই এমন কাজ তাঁর উপর সোপর্দ করেছেন যাতে তাঁর এই ব্যাধির চিকিৎসা হয়ে যায়।

কিছুদিন পর শাইখ এটা দেখার জন্য যে, শাহযাদেগীর খেয়াল ও কল্পনা এখনো তাঁর অন্তরে আছে নাকি খতম হয়ে গেছে? তাঁর পরীক্ষার জন্য শাইখ নিজের বাসার মেথর যে বাসার ময়লা আবর্জনা উঠিয়ে নিয়ে যেত, তাকে বললেন: আজ যখন ময়লা নিয়ে যাবে, তখন হাম্মামের পাশে হাম্মামের আগুন আলোকিত করার জন্য যে লোকটি নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তার পাশ দিয়ে যাবে। আর সে তোমাকে যা কিছু বলবে সেটা এসে আমাকে জানাবে।

ফলশ্রুতিতে যখন ঐ মেথর ময়লা আবর্জনা নিয়ে সেই ছাহেবযাদার পাশ দিয়ে গেল, তখন তার প্রচন্ড গোস্বা আসল এবং বলল যে, আজ যদি আমার এলাকা গাঙ্গুহ হত তাহলে তুমি এই ময়লা-আবর্জনা নিয়ে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সাহসই পেতে না।

মেথর শাইখকে জানিয়ে দিল যে, সে এই মন্তব্য করেছে। শাইখ চিন্তা করলেন ও বুঝলেন যে, সুলূকের পথে সে এখনো কাঁচাই আছে। এখনো কিছু অহংকার আছে। ফলে ঐ হাম্মামের পানি গরমের আদেশ বলবৎ রাখা হল।

দ্বিতীয় পরীক্ষা

কিছুদিন যাওয়ার পর শাইখ পুনরায় ঐ মেথরকে বলেছেন যে, এখন ময়লা উঠিয়ে নিয়ে যাও। আর এবার একদম তার পাশ ঘেঁষে যাবে। ফলে ঐ মেথর আরো বেশি কাছ দিয়ে গেল। ফলে ছাহেবযাদা ঐ মেথর এর দিকে গোস্বার দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু এবার মুখে কিছু বললেন না। ঐ মেথর গিয়ে শাইখকে জানিয়ে দিল যে, আজ এই ঘটনা হয়েছে। শাইখ অনুধাবন করতে পারলেন যে, ঔষধ কার্যকর হচ্ছে।

তৃতীয় পরীক্ষা

কিছুদিন পর শাইখ তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন: এবার তার এতটুকু পাশ দিয়ে যাবে যেন ময়লা-আবর্জনা তার গায়েও লেগে যায়। আর সেখান থেকে কিছু ময়লা যেন তার গায়েও পড়ে। ফলে মেথরটি যখন তার পাশ দিয়ে গেল, আর কিছু ময়লা তার গায়েও ফেলে দিল, তখন ঐ ছাহেবযাদা নজর উঠিয়েও দেখেননি। মেথর শাইখকে হালত জানাল। শাইখ বললেন: হ্যাঁ উপকার হচ্ছে।

চতুর্থ পরীক্ষা

কিছুদিন পর শাইখ পুনরায় মেথরকে নির্দেশ দিলেন যে, এবার ময়লার টুকরী নিয়ে তার পাশ দিয়ে যাবে। আর কোন কিছুর সাথে টক্কর খেয়ে তার পাশে এমনভাবে পড়বে যেন পুরো ময়লা-আবর্জনা তার উপর পড়ে। এরপর সে কী করে তা আমাকে জানাবে। ফলে ঐ মেথর গেল আর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। যখন ছাহেবযাদা দেখল যে, মেথর পড়ে গেছে, তখন তার নিজের চিন্তার পরিবর্তে মেথরের চিন্তা হল। আর তাকে জিজ্ঞেস করল যে, ভাই! তুমি কোন চোট্ পাওনি তো? নিজের কোন চিন্তা নাই যে, আমার কাপড় নোংরা হয়ে গেছে। মেথর শাইখকে ঘটনার বিবরণ শুনাল। শাইখ বললেন: এবার সফলতার আশা করা যায়।

বড় পরীক্ষা এবং দৌলতে বাতেনী লাভ

এরপর আরেকটি ঘটনা ঘটল। সেটা হল শাইখ বলখী রহ. শিকারের উদ্দেশ্যে বাইরে যেতেন। সঙ্গে শিকারী কুকুরও থাকত। সম্ভবত এর মধ্যে তিনি কোন দ্বীনী হেকমত দেখেছেন। আর শিকারী কুকুরের মাধ্যমে শিকার করা কোন নাজায়িয কাজও না বরং জায়িয আছে।

যাই হোক ঐ শাইখ একবার শিকারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় এই ছাহেবযাদাকেও সাথে নিয়ে নিলেন আর শিকারী কুকুরের লৌহশিকল ছাহেবযাদার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ঐ শিকারী কুকুরগুলো ছিল খুব শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান। অথচ এই বেচারা ছিল ক্ষুধার্ত ও দুর্বল।

ফলশ্রুতিতে যখন শিকারী কুকুরগুলো শিকারের পিছনে দৌড় লাগাল আর এই বেচারা দুর্বল হওয়ার কারণে ঐ কুকুরগুলোর সাথে পেরে উঠতে পারল না। তখন সে পড়ে গেল। যেহেতু শাইখের পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই শিকল হাতছাড়া করা যাবে না। এজন্য তিনি শিকল ছাড়েননি। হেঁচড়ে চলার কারণে রক্তাক্ত হয়ে যান। কিন্তু শাইখের নির্দেশ পালনার্থে শিকল হাত থেকে ছেড়ে দেননি।

এ ঘটনার পর রাত্রে শাইখ নিজ পীর ও মুরশিদ হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বলছেন: "আমি তো তোমার থেকে এত মেহনত নিইনি।" কেননা পিতার অন্তরে সব সময় সন্তানের খেয়াল থাকে।

ফলে পরের দিন শাইখ সকালে তাঁকে ডেকে বুকের সাথে লাগালেন এবং বললেন যে, যে দৌলত ও নেয়ামত আমি তোমার আব্বা থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তুমি সে দৌলত চেয়েছিলে, যা তোমার আমানত ছিল। সেই দৌলতই আমি তোমার কাছে সমর্পণ করে দিলাম। আর যেহেতু এই কর্মপদ্ধতি ব্যতীত ঐ দৌলত পাওয়া অসম্ভব ছিল। এজন্য আমি এরূপ অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছি।

গোস্বা নিয়ন্ত্রণে রাখুন, ফেরেশতাদের থেকে আগে বেড়ে যান

যাই হোক, আমি একথা আরয করছিলাম যে, যখন এই ছাহেবযাদা নিজের ইসলাহের জন্য সেখানে (বলখ) গেলেন, তখন শাইখ তাঁকে ওয়াযীফাও বাতলে দেননি, তাসবীহাতও পড়তে দেননি। না অন্য কোন মামূলাত। বরং কাজ করিয়েছেন যার দ্বারা মস্তিষ্ক হতে অহংকার বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথে সুন্দর আচরণ করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এই গোস্বা যেটা অহংকারের মূল কারণ ও ফলাফল হয়ে থাকে সেটা খতম হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন; সুলূক ও তাসাওউফের বিশাল অধ্যায় এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হল মানুষের তবিয়ত হতে গোস্বা বের হয়ে যাবে এবং গোস্বার উপর নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে। আর

যখন এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা মানুকে এমন মাকামে পৌঁছে দেন যে, ফেরেশতারাও তাঁকে ঈর্ষা করে। ফেরেশতাদের মধ্যে তো গোস্বা থাকেই না। উপরন্তু তারা সব সময় ইবাদতে থাকেন এবং তাঁদের দ্বারা কারো কষ্ট হয় না, তো এটা কোন কৃতিত্বের ব্যাপার নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আমি ফেরেশতাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু মানুষ ও আদমের সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই আমি গোস্বা রেখেছি। মানুষ হয়ত আমার ভয়ে অথবা আমার ভালোবাসায় নিজ গোস্বাকে দাবিয়ে রাখে। যদ্দরুন সে ফেরেশতাদের থেকেও আগে বেড়ে যায়। কিভাবে বেড়ে যায়? শুনুন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর একটি ঘটনা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর ফিকহের উপর আমরা সবাই আমল করি। সারা দুনিয়ায় মহান আল্লাহ তাঁর ফয়েয চালু করে দিয়েছেন। তাঁর সাথে হিংসাকারী মানুষ ছিল অনেক। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁকে অনেক উঁচু মাকাম দান করেছিলেন, প্রসিদ্ধি দান করেছিলেন, ইলম দান করেছিলেন। অবশ্য তাঁর ভক্তবৃন্দও ছিলেন অনেক। এজন্য হিংসুকও অনেক ছিল। হিংসার কারণে মানুষ তাঁর বদনাম করত। সমালোচনা করত।

একদিন তিনি বাসায় যাওয়ার জন্য বের হলেন, তো একজন মানুষ তাঁর সাথে লেগে গেল আর পুরো পথ গালি দিতে থাকল। আপনি এমন! আপনি তেমন ইত্যাদি। যখন গলির মোড় আসল, তখন ইমাম ছাহেব থামলেন আর ঐ ব্যক্তিকে বললেনঃ ভাই! যেহেতু এই মোড় থেকে আমার পথ পৃথক হয়ে যাবে, কেননা আমার বাসার মোড় এসে গেছে। আপনার পথও আলাদা হয়ে যাবে। আপনার অন্তরে যেন কোন অনুশোচনা না থাকে এজন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। আপনার যত গালি দিতে মনে চায়, এখানে দাঁড়িয়ে দিয়ে দিন। এরপর আমি আমার বাসায় চলে যাব।

ঘটনাটি কিতাবে লিখিত পাওয়া যায়।

চল্লিশ বছর যাবত ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায

আমি আমার শাইখ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব জালালাবাদী রহ. থেকে শুনেছি যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়তেন।

এটারও অদ্ভুত একটা কাহিনী আছে। শুরু দিকে তাঁর এমন অভ্যাস ছিল না। বরং শুরুর দিকে তাঁর মামূল বা অভ্যাস ছিল শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় এক বৃদ্ধা মহিলাকে বলতে শুনলেন "ইনি ঐ ব্যক্তি যিনি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েন।"

ব্যস একথা শোনামাত্রই ইমাম ছাহেবের আত্মমর্যাদা জেগে উঠল যে, এই বৃদ্ধা মহিলা তো আমার ব্যাপারে এ ধারণা রাখে যে, আমি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়ি। অথচ আমি পড়িনা। যার মানে হল আমার এমন বিষয়ের প্রশংসা করা হচ্ছে, যা আমার মধ্যে বিদ্যমান নেই।

ঐদিন থেকেই তিনি পাক্কা নিয়্যত করলেন যে, বাকী সারাজীবন ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়বেন। ফলশ্রুতিতে তিনি মামূল এমনটি বানালেন যে, সারারাত ইবাদত করতেন এবং ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়তেন। আবার ব্যাপার এমন ছিল না যে, যখন সারারাত ইবাদত করেছে, তো এখন সারাদিন শুধু ঘুমাবেন। কেননা ইমাম ছাহেবের ব্যবসাও ছিল। দরস-তাদরীসের পবিত্র অভ্যাসও ছিল। লোকজন তাঁর নিকট এসে ইলম অর্জন করতেন।

এজন্য তিনি সারারাত ইবাদত করতেন এবং ফজর নামাযের পর দরস ও তাদরীস এর খেদমত আঞ্জাম দিতেন। যোহরের নামায পর্যন্ত একাজে ব্যস্ত থাকতেন। যোহরের নামাযের পর হতে আসর পর্যন্ত ঘুমানোর মা'মূল ছিল।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. যোহরের নামাযের পর নিজ বাসায় তাশরীফ নিয়ে গেছেন। উপর তলায় তাঁর ঘর ছিল। ঘরে গিয়ে আরাম করার জন্য বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে কেউ একজন নিচের গেইটে কড়া নাড়লেন।

আপনি অনুমান করুন। যে মানুষটি সারা রাত জেগে ছিলেন এবং সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন। ঐ সময় তাঁর মনের অবস্থা কেমন হবে? এ সময় কোন মানুষ আসলে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইমাম ছাহেব উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন। দরওয়াযা খুললেন তো দেখলেন যে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। ইমাম ছাহেব রহ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কেন এসেছেন? তিনি বললেন: একটা মাসআলা জানতে এসেছি।

দেখুন, যখন ইমাম ছাহেব মাসআলা বলার জন্য বসেছেন, সেখানে এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করার খবর নেই। এখন অসময়ে পেরেশান করার জন্য এখানে এসে গেছে। কিন্তু ইমাম ছাহেব তাকে কিছু বলেননি বরং বলেছেন: আচ্ছা ভাই! কী মাসআলা জানতে চান? সে বলল: হযরত কী বলব আসার পূর্বেও মনে ছিল, এখন ভুলে গেছি। ইমাম ছাহেব বললেন: ঠিক আছে মনে পড়লে আবার জিজ্ঞেস করে নিবেন।

এভাবে পরপর তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ইমাম ছাহেব উপরে গিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতেই সে নিচ থেকে আওয়ায দেয়। আর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে যে, মাসআলা জানতে এসেছিলাম কিন্তু এখন ভুলে গেছি! আর ইমাম ছাহেবও বলেন: ঠিক আছে। সামনে মনে পড়লে জিজ্ঞেস করে নিবেন।

সর্বশেষে ইমাম ছাহেবের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে বললেন যে, হযরত! আমি জানতে এসেছি যে, মানুষের নাপাকী বা পায়খানার স্বাদ কেমন হয়? তিতা নাকি মিঠা? (নাউযুবিল্লাহ, এটাও কোন মাসআলা)

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেত

যদি অন্য কোন মানুষ হত, আর সে এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে থাকত, তো এখন এ প্রশ্নের পর তার ধৈর্যের বাঁধ অবশ্যই ভেঙ্গে যেত। কিন্তু ইমাম ছাহেব অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন যে, যদি মানুষের নাপাকী তাজা হয় তাহলে এর মধ্যে কিছুটা মিষ্টিভাব থাকে। আর যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলল যে, আপনি কি চেখে দেখেছেন? (নাউযুবিল্লাহ)

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন: সব জিনিসের ইলম চাখার দ্বারা হাসিল করা যায় না বরং কোন কোন জিনিসের ইলম আকল দ্বারা হাসিল করা হয়। আর আকল দ্বারাই এটা জানা যায় যে, তাজা নাপাকীর উপরে মাছি বসে, শুকনো নাপাকীর উপর বসে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, উভয়টির মধ্যে পার্থক্য আছে। নতুবা মাছি উভয়টার উপরই বসত।

নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ ধৈর্যশীল

যখন ইমাম ছাহেব এ উত্তর দিয়ে দিলেন তখন ঐ ব্যক্তি বলল: ইমাম ছাহেব হুযূর! আমি আপনার নিকট করজোড় করে অনুরোধ করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আজ আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন।

ইমাম ছাহেব বললেন: আমি কিভাবে হারিয়ে দিলাম? লোকটা বলল: আমার এক বন্ধুর সাথে আমার তর্ক চলছিল যে, এ যুগে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল কে? আমার বক্তব্য ছিল এই যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল। কিন্তু আমার বন্ধুর বক্তব্য হল ইমামে আযম অর্থাৎ আপনি সব থেকে বেশি ধৈর্যশীল।

এই প্রেক্ষিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য চিন্তা করলাম যে, এমন এক সময় আপনার কাছে আসব যখন আপনার আরামের সময়। এভাবে

দুই তিন বার আপনাকে উপর নিচে দৌড়াদৌড়ি করাব। এরপর আপনার কাছে বেহুদা কোন একটা প্রশ্ন করব আর দেখব যে, আপনার রাগ আসে কিনা? যদি রাগ আসে তো আমি জিতে গেলাম। আর রাগ না আসলে আপনি জিতে গেলেন। কিন্তু আজ আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। আর বাস্তব সত্য কথা এই যে, আমি এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আপনার মত ধৈর্যশীল কোন মানুষ দেখিনি।

এর দ্বারা অনুমান করুন, হযরত ইমামে আযম রহ. কোন্ মাকামের মানুষ ছিলেন? তাঁর উপর যদি ফেরেশতাদের ঈর্ষা না আসে, তাহলে কার উপর আসবে? তিনি স্বীয় নফসকে বিলকুল মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

"হিলম" বা ধৈর্য সৌন্দর্য দান করে

তাইতো হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَللّٰهُمَّ أَغِنِّىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ بِالْحِلْمِ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন ইলম দ্বারা এবং আমাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করুন "হিলম" বা ধৈর্য দ্বারা।"[৭১]

কোন মানুষের কাছে যদি ইলম বা জ্ঞান থাকে কিন্তু হিলম বা সহিষ্ণুতার গুণ না থাকে, তাহলে ইলম সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য আসবে না। এ পথে চলার জন্য এবং স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল গোস্বা করবে না। এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: لَا تَغْضَبْ তুমি গোস্বা করনা। এটাই প্রথম সবক এবং এটাই সংক্ষিপ্ত উপদেশ। আর এটাই মহান আল্লাহর গোস্বা হতে বাঁচার উপায়।

---

৭১. কানযুল উম্মাল হাদীস নং ৩৬৬৩

গোস্বা হতে বাঁচার কৌশলসমূহ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি যে, "গোস্বা করো না"। বরং গোস্বা হতে বাঁচার কৌশল কুরআনও বলেছে এবং জনাব রাসূলে কারীমও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। এই কৌশলের দ্বারা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুশীলন করা হয়।

প্রথম কথা হল মানুষের ইখতিয়ারের বাইরে যে গোস্বা এসে যায় এবং মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ঐ গাইরে ইখতিয়ারী উত্তেজনার উপর মহান আল্লাহর কাছে কোন ধরপাকড় হবে না। কেননা সেটা মানুষের ইখতিয়ারের বাইরে।

অবশ্য মনের মধ্যে যে জোশ পয়দা হয় সেটাকে নিজ সীমারেখার মধ্যে রাখুন। সেটার প্রভাব নিজ কোন কাজে পড়তে দিবেন না। উদাহরণস্বরূপ কারো উপর গোস্বা আসল, তো এ গোস্বা আসাটা কোন গুনাহ নয় কিন্তু যদি এ গোস্বার ফলে কাউকে প্রহার করে অথবা কাউকে বকাঝকা করে বা গীবত করে, তাহলে তো ঐ গোস্বার তাকাযার উপর আমল হয়ে গেল। এখন এর উপর পাকড়াও হবে এবং এটা গুনাহ।

গোস্বার সময় أَعُوْذُ بِاللهِ পড়ুন

এজন্য কখনো মনের মধ্যে এ জাতীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ঐ কাজ করবেন যেটার নির্দেশ মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ

অর্থাৎ "আর যদি শয়তান তোমার অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে, তাহলে মহান আল্লাহর নিকট (বিতাড়িত শয়তান হতে) আশ্রয় কামনা কর।"[৭২]

---

৭২. সূরা আরাফ, আয়াত নং ২০০

এজন্য গোস্বা আসা মাত্রই أَعُوْذُ بِاللهِ পড়ে নিন। এটা কোন কঠিন কাজ নয়। সামান্য ধ্যান আর অনুশীলনের প্রয়োজন।

গোস্বার সময় বসে যাও বা শুয়ে পড়

গোস্বা আসলে দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হবে সেটার ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদ করেছেন এবং এটা বড় অদ্ভুত পরীক্ষিত একটি আমলও বটে। সেটা হল গোস্বার তীব্রতা থাকলে যদি আপনি দাঁড়ানো থাকেন তাহলে বসে পড়বেন। এরপরও গোস্বা না কমলে শুয়ে পড়বেন। কেননা গোস্বার বৈশিষ্ট্য হল এটা উপরে মস্তিষ্কের দিকে চড়ে। আর যখন গোস্বার প্রাবল্য থাকে, তখন মানুষ উপরের দিকে উঠে। কেননা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন গোস্বার সময় যদি মানুষ শোয়া অবস্থায় থাকে, তাহলে উঠে বসে পড়ে। বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যায়। এজন্য এটাকে খতম করার কৌশল বলতে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সেটার উল্টো কাজ করো। অতএব গোস্বার সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাও, বসে থাকলে শুয়ে পড় এবং নিজের অবস্থাকে নিচের দিকে নিয়ে আসো।”

এই কৌশল প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন এ লোকগুলো গোস্বার ফলে না জানি কোন্ মুসীবতের সম্মুখীন হবে? এজন্য তিনি এই কৌশল বাতলে দিয়েছেন।[৭৩]

অন্য একটি বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, মানুষ ঐ সময় পানি পান করবে।

গোস্বার সময় মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করবে

গোস্বা নিয়ন্ত্রণে আনার আরেকটা কৌশল হল মানুষ চিন্তা করবে যে, যে ধরনের গোস্বা আমি ঐ মানুষটির উপর করতে চাই, যদি

---

৭৩. সুনানে আবূ দাউদ, আদব অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা আমার উপর ঐ ধরনের গোস্বা করেন, তাহলে আমার অবস্থা কেমন হবে?

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. স্বীয় ক্রীতদাসের উপর গোস্বা করছেন এবং বকাঝকা করছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন اَللّٰهُ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَيْهِ মনে রেখ, তোমার যে পরিমাণ ক্ষমতা এই দাসটির উপর আছে। তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা মহান আল্লাহর তোমার উপর আছে। তুমি যেই ক্ষমতাবলে একে কষ্ট দিচ্ছ এর থেকে অনেক বেশি ক্ষমতা মহান আল্লাহর তোমার উপর আছে।

আল্লাহ তাআলার ধৈর্য

আল্লাহ তাআলার ধৈর্য দেখুন। কিভাবে প্রকাশ্যে তাঁর অবাধ্যতা হচ্ছে, কুফর হচ্ছে, শিরক হচ্ছে, এমনকি মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহান আল্লাহ এদের সবাইকে রিযিক দিচ্ছেন। বরং আল্লাহ পাক তাঁর কোন কোন বিদ্রোহী বান্দার উপর তো দুনিয়াবী দৌলতের স্তূপ লাগিয়ে দেন!! কী অপরিসীম ধৈর্য মহান আল্লাহর!

এজন্য এটা ভাবতে হবে যে, যখন মহান আল্লাহ নিজ গোস্বাকে নিজ বান্দাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন না, আমার উপরও তাঁর গোস্বার প্রয়োগ করছেন না, তাহলে আমি আমার অধীনস্তদের উপর কেন গোস্বা ব্যবহার করব?

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর ক্রীতদাসকে বকা দেয়া

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযি. কে দেখলেন যে, তিনি নিজ ক্রীতদাসকে বকাঝকা করছেন, তখন তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন:

لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

অর্থাৎ "একদিকে তুমি স্বীয় ক্রীতদাসকে বকাঝকাও করবে আবার "সিদ্দীক"ও হয়ে যাবে, কাবার রবের কসম, এমনটি হতে পারে না।"[৭৪]

এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গোস্বা করতে বারণ করেছেন।

এজন্য অন্যের উপর গোস্বা আসলে এটা চিন্তা করতে হবে যে, আমার এ ব্যক্তির উপর যে পরিমাণ ক্ষমতা আছে এর থেকে অনেক বেশি শক্তি মহান আল্লাহর আমার উপর আছে। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে পাকড়াও করেন তাহলে আমার কোথায় ঠিকানা হবে?

যাই হোক, গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এই কয়েকটি কৌশল বলা হল, যা কুরআনে কারীম এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ আমাদেরকে বাতলিয়েছে।

শুরুতেই গোস্বাকে একদম দমিয়ে রাখতে হবে

প্রাথমিক পর্যায়ে যখন মানুষ স্বীয় আখলাকের ইসলাহ বা সংশোধন আরম্ভ করে, তো ঐ সময় হক নাহকের ফিকিরও করবে না। অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন আছে যেখানে গোস্বা করা জায়িয ও বৈধ। কিন্তু একজন প্রাথমিক পর্যায়ের সালিকের জন্য যিনি আপন নফসের ইসলাহ আরম্ভ করছেন, তার জন্য করণীয় হল হক নাহকের পার্থক্য ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গোস্বাকে দমিয়ে রাখা, যাতে করে ধীরে ধীরে এই বদ অভ্যাস স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে।

যদি একবার এটাকে দাবিয়ে দেয়া যায় এবং তার বিষ বের করে দেয়া যায়, তো পরবর্তীতে যখন ঐ গোস্বাকে ব্যবহার করা হবে তখন ইনশাআল্লাহ সঠিক স্থানে ব্যবহার হবে। কিন্তু শুরুতে কোন স্থানেই গোস্বা করবে না। চাই আপনার এটা জানা থাক যে, আমার এখানে গোস্বার হক আছে। তারপরও গোস্বা করবে না। আর যখন এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে তখন গোস্বা করা হলে সেই গোস্বা সীমার ভিতরে থাকবে। সীমার বাইরে যাবে না, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকবে।

---

৭৪. শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৭৯১

গোস্বায় ভারসাম্য

অনেক সময় গোস্বার প্রয়োজন হয়। বিশেষত যাদের তারবিয়্যাত বা দীক্ষার দায়িত্ব থাকে। উদাহরণস্বরূপ পিতার নিজ সন্তানদের সাথে গোস্বা করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষককে ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য এবং শাইখকে তাঁর মুরীদদের ইসলাহের জন্য গোস্বা করতে হয়।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যতটুকু গোস্বা করার দরকার অতটুকুই করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গোস্বা করা অন্যায়। কেননা প্রয়োজন এর অতিরিক্ত গোস্বার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত জেদ মেটানোও শামিল হয়ে যাবে, যদ্দরুন সে গুনাহগারও হবে। আর তাতে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নানা মেযাজী রং

অধিকাংশ আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে আপনারা শুনেছেন যে, তাঁরা নিজেদের সমস্ত মুরীদ ও মুতাআল্লিকীনের সাথে স্নেহ ও মহব্বতপূর্ণ আচরণ করেন। রাগারাগি বা গোস্বা করেন না। কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাদের রং বিভিন্ন ধরনের হয়। কারো উপর দয়ার প্রাধান্য, তো তিনি দয়া ও মায়ার মাধ্যমে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষদের রূহানী চিকিৎসা করতে থাকেন। আবার কারো উপর জালালী তবিয়তের প্রাবল্য হয় তিনি ঐ জালালের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। কিন্তু ঐ জালাল বা কড়া মেযাজ তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেটা সীমার বাইরে যায় না।

এই যে একটা কথা প্রসিদ্ধ যে, অমুক বুযুর্গ খুব জালালী প্রকৃতির ছিলেন। তো 'জালালী' হওয়ার মর্ম এটা নয় যে, তিনি যেখানে সেখানে শুধু গোস্বাই করতে থাকেন। আর স্বাভাবিক সীমার বাইরে গোস্বা করেন। বরং যে সময় যার সাথে যতটুকু গোস্বা করা দরকার তার সাথে ঐ সময় ততটুকুই গোস্বা করেন। আর 'তারবিয়্যতে বাতেনী' তথা আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য তাঁরা এটার প্রয়োজন অনুভব করতেন। সেই অনুপাতেই তাঁরা গোস্বা করতেন।

তাইতো আমাদের বুযুর্গ হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর ব্যাপারে এই যে একটা কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি বড় জালালী বুযুর্গ ছিলেন। ফারূকী ছিলেন অর্থাৎ হযরত উমর ফারূক রাযি. এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। এজন্য তবিয়তে গাইরত বা আত্মমর্যাদাও বেশি ছিল। কিন্তু তাঁর তারবিয়্যাতের অধীনে যে সব সালিক বা আল্লাহর পথের পথিক ছিলেন তাঁদের ব্যাপারে কখনোই তাঁর গোস্বা সীমার বাইরে যায়নি। আর সাধারণ অবস্থায় তাঁর মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বিরাজমান থাকত।

গোস্বার সময় ধমক দেয়া নিষেধ

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলতেন, আমি অন্যদেরকেও এ কথা বলি আর আমার নিজের আমলও এটাই যে, যারা আমার তারবিয়্যাতের অধীনে আছে, তার সাথে আমি গোস্বা করি বটে, কিন্তু যে আমার তারবিয়্যাতের অধীনে নয় তার উপর আমি কখনো গোস্বা করি না। হযরত থানভী রহ. আরো বলতেন: "যখন মনের মধ্যে গোস্বা থাকে, তখন কাউকে ধমক দিবে না বরং তখন খামুশ হয়ে যাও। পরবর্তী সময়ে যখন গোস্বা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন কৃত্রিম গোস্বা পয়দা করে পুনরায় বকা দাও। কেননা কৃত্রিম গোস্বা কখনো সীমার বাইরে যাবে না। পক্ষান্তরে প্রচন্ড উত্তেজিত অবস্থায় গোস্বা করলে সেটা সীমার বাইরে চলে যাবে।"

হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. বলতেন: "আলহামদুলিল্লাহ, যখন আমি কাউকে আদব দেয়ার জন্য শাস্তি দিই, তখন ঠিক ঐ শাস্তি প্রদানের মুহূর্তেও মনের মধ্যে এ কথাটা থাকে যে, তার মর্যাদা আমার থেকে বেশি। এবং সে আমার থেকে উত্তম। আমি তো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য আদিষ্ট। এজন্য এ কাজ করছি।"

অতঃপর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন: যেমন কোন বাদশাহ নিজ শাহজাদার কোন অন্যায় কাজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে জল্লাদকে নির্দেশ দিল যে, "এই শাহজাদাকে বেত্রাঘাত কর", তো এখন ঐ জল্লাদ বাদশাহর নির্দেশে শাহজাদাকে বেত্রাঘাত করবে সত্য, কিন্তু আঘাত

করার সময়ও জল্লাদ এটাই চিন্তা করবে যে, সে হল শাহজাদা আর আমি হলাম জল্লাদ। তার মর্যাদা বেশি। কিন্তু বাদশাহর নির্দেশের কারণে বাধ্য হয়ে বেত্রাঘাত করছি।"

অতঃপর হযরত হাকীমুল উম্মাত বলেন: আলহামদুলিল্লাহ। পুরোপুরি গোস্বার মুহূর্তেও আমার অন্তরে এ খেয়াল জাগ্রত থাকে, এর মর্যাদা আমার থেকে বেশি। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হয়ে এ দায়িত্ব পালন করছি। এজন্য তাকে বকা দিচ্ছি বা শাস্তি দিচ্ছি।

তো হযরত থানভী রহ. বলতেন: একদিকে আমি তাকে বকাঝকা করছি, পাকড়াও করছি আর অপরদিকে আমি দিলে দিলে এই দু'আ করছি, ইয়া আল্লাহ! যেভাবে আমি তাকে পাকড়াও করছি, সেভাবে আখেরাতে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর যেভাবে আমি তাকে বকাঝকা করছি, ইয়া আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমার সাথে সেরকম মুআমালা করবেন না। কেননা যা কিছু আমি করছি, আপনার নির্দেশ মনে করেই করছি।

যাই হোক, ইসলাহ ও তারবিয়্যাতের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে এই ছিল হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর গোস্বা। অথচ লোকেরা তাঁর ব্যাপারে এমনিতেই প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে যে, তিনি বড় জালালী মেযাজের বুযুর্গ ছিলেন।

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর একজন পুরানো খাদেম ছিলেন। নাম হল ভাই নিয়ায ছাহেব রহ.। থানাভবন খানকায় হযরত থানভী রহ. এর নিকট থাকতেন। যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত হযরতের খেদমত করে আসছিলেন এজন্য কিছুটা মুখরা হয়ে গিয়েছিলেন।

একবার কেউ একজন হযরতের নিকট এসে তার ব্যাপারে অভিযোগ করেন যে, ভাই নিয়ায খুব মুখরা হয়ে গেছেন। অনেক সময় খানকাহে আগন্তুকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

হযরতওয়ালা এটা শুনে বিষণ্ন হলেন যে, আরে এটা তো খুবই খারাপ কথা। আগন্তুক মেহমানদের সাথে এমন আচরণ। ফলশ্রুতিতে

হযরত তাকে ডেকে বললেন, ভাই নিয়ায! তুমি নাকি আগন্তুকদের সাথে লড়াই ঝগড়া কর আর অভদ্রভাবে কথাবার্তা বল?

এটা শুনে ভাই নিয়াযের মুখ থেকে এ বাক্য বের হয়ে যায় "হযরত! মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন।"

বাহ্যিকভাবে ভাই নিয়ায সাহেব এটা বলতে চাচ্ছিলেন যে, যারা আমার ব্যাপারে আপনার নিকট অভিযোগ পেশ করেছে যে, আমি মানুষদেরকে বকাঝকা দেই, তারা যেন মিথ্যা না বলে, আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে "মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন।"

দেখুন একজন সামান্য খাদেম তার মনিবকে বলছে, মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন। এ পরিস্থিতিতে তো ঐ খাদেম আরো বেশি তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উপযুক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একথাটা শোনামাত্রই দৃষ্টি নত করে ফেললেন এবং আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আসল কথা হল, ভাই নিয়াযের এ কথা শুনে হযরত হাকীমুল উম্মাতের চৈতন্যোদয় হল যে, আমি তো এক তরফা কথা শুনে তাকে ধমক দেয়া আরম্ভ করেছি। তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করিনি। তার ব্যাপারে কেউ একজন আমাকে জানানোর প্রেক্ষিতে তাকে বকাঝকা দেয়া শুরু করেছি। এ কাজটি আমি ঠিক করিনি।

এজন্য সঙ্গে সঙ্গে "ইসতিগফার" করতে করতে সেখান থেকে চলে গেছেন। এমন মহান ব্যক্তির ব্যাপারেই কিনা মন্তব্য করা হচ্ছে তিনি জালালী বুযুর্গ ছিলেন। মানুষদেরকে খুব বকাঝকা দিতেন!

বকাঝকার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: বাস্তবিক পক্ষে আমরা হযরত থানভী রহ. এর

ওখানে স্নেহ ও ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। অবশ্য অনেক সময় মানুষের ইসলাহ বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে বকাঝকার প্রয়োজন হত, তো সেটাও খুব লক্ষ্য রেখে করতেন।

যাই হোক, ছোট কাউকে বকার প্রয়োজন হলে মানুষের উচিত এসব বিষয় লক্ষ্য করে তারবিয়্যাত করা। উদাহরণস্বরূপ, সর্ব প্রথম এটা খেয়াল করবে যে, একে বকাঝকা করার দ্বারা আমার গোস্বা বের করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। বরং আসল উদ্দেশ্য হল তার ইসলাহ ও সংশোধন। যার পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন যে, পুরোপুরি গোস্বার মুহূর্তে কোন পদক্ষেপ নিবে না বরং যখন গোস্বা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন চিন্তা-ভাবনা করে যতটুকু গোস্বা করা দরকার, কৃত্রিম গোস্বা সৃষ্টি করে অতটুকুই গোস্বা কর। এর থেকে যেন কমও না হয়, বেশিও না হয়। কিন্তু যদি উত্তেজিত অবস্থায় গোস্বার উপর আমল করে ফেলে, তবে দেখা যাবে যে, গোস্বা নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র

এখন দেখার বিষয় হল এই গোস্বার সঠিক ক্ষেত্র ও স্থান কি? গোস্বা করার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র এবং সঠিক স্থান হল আল্লাহ তাআলার নাফরমানী ও গুনাহসমূহ। এসব জিনিসকে মানুষ ঘৃণা করবে এবং এগুলো দূর করার জন্য যতটুকু গোস্বা দরকার অতটুকু গোস্বা মানুষ ব্যবহার করবে। এটা হল গোস্বার প্রথম ক্ষেত্র।

পরিপূর্ণ ঈমানের চারটি আলামত

একটি হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ أَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَأَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهٗ

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে অথবা আল্লাহর জন্যই কাউকে কোন কিছু হতে বিরত রাখে আর

আল্লাহর জন্য মহব্বত করে ও আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।"[৭৫]

তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

প্রথম আলামত

এ হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪টি জিনিসকে পূর্ণ ঈমানের আলামত বলেছেন।

প্রথম আলামত হল যখন দিবে আল্লাহর জন্য দিবে। এর মর্ম হল যদি কোন নেকীর ক্ষেত্রে কোন খরচ করে তাহলে সেই খরচ করাটা যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়।

মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে, পরিবারের সদস্যদের জন্যও খরচ করে, সদকা খাইরাতও করে। এসব ক্ষেত্রে খরচের সময় যেন একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশী করার নিয়্যত থাকে অর্থাৎ আমি দান-খাইরাত শুধু এজন্য করব, যেন আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাকে সওয়াব দান করেন। দান-সাদাকার দ্বারা যেন অন্যের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন বা সুনাম সুখ্যাতি কামনা উদ্দেশ্য না হয়। তাহলেই এ সাদাকা প্রদান আল্লাহর জন্য হবে।

দ্বিতীয় আলামত

দ্বিতীয় আলামত হল, "مَنَعَ لِلّٰهِ" অর্থাৎ "যদি না দেয় সেটাও আল্লাহরই জন্য"। উদাহরণস্বরূপ কোন স্থানে পয়সা খরচ হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখল। সেটাও একমাত্র আল্লাহ পাকেরই জন্য। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন, অনর্থক ব্যয় করবে না। এজন্যই সে অনর্থক খরচ না করে পয়সা বাঁচায়। এই বিরত রাখাও আল্লাহর জন্য হয়ে গেল। এটাও ঈমানের আলামত।

---

৭৫. তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় নং ৬১

তৃতীয় ও চতুর্থ আলামত

তৃতীয় আলামত হল وَأَحَبَّ لِلّٰهِ অর্থাৎ যদি কাউকে মহব্বত করে, তবে সেটাও আল্লাহর জন্যই করে। উদাহরণস্বরূপ কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে যে মহব্বত হয় সেটা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয় বরং তাঁদের সাথে মহব্বত এজন্য হয় যে, তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখলে আমাদের দ্বীনী উপকার হবে এবং আল্লাহ তাআলা খুশী হবেন।

এই মহব্বত ও ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং এটা ঈমানের আলামত।

চতুর্থ আলামত হল وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য গোস্বা করে। যার প্রতি রাগ বা গোস্বা, সেটা তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয় বরং কোন মন্দ কর্মের কারণে অথবা তার এমন কোন কথা বা কাজের কারণে যা প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির উপলক্ষ। তো এই গোস্বা ও অসন্তুষ্টি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই হল। এটাও গোস্বার একটি বৈধ ক্ষেত্র।

ব্যক্তিকে ঘৃণা করব না

এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন একটা কথা বলেছেন যা সব সময় মনে রাখার মত। সেটা হল ঘৃণা ও বিদ্বেষ কোন কাফেরের সাথে নয় বরং তার "কুফর" এর সাথে। ফাসেকের সাথে বিদ্বেষ নয় বরং তার "ফিসক" এর সাথে বিদ্বেষ। গুনাহগারের প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নয় বরং ঘৃণা বা বিদ্বেষ হল ঐ গুনাহের প্রতি যে গুনাহ বা পাপকাজে সে মানুষটি লিপ্ত। তার সত্তা গোস্বার ক্ষেত্র নয় বরং তার কাজ হল গোস্বার ক্ষেত্র। কেননা ব্যক্তিসত্তা তো রহমতের যোগ্য। সে বেচারা অসুস্থ। কুফরের ব্যাধিতে আক্রান্ত। ফিসকের রোগে লিপ্ত। মানুষ রোগকে ঘৃণা করে ব্যক্তিকে নয়। কেননা ব্যক্তিরা রোগীকে ঘৃণা করলে তার দেখাশুনা কে করবে?

সুতরাং আমাদের ঘৃণা হবে কুফর, ফিসক ও গুনাহের প্রতি। কাফের, ফাসেক, বা গুনাহগারের প্রতি নয়।

এ কারণেই তো ঐ মানুষটা যদি কুফর, ফিসক বা পাপাচার হতে ফিরে আসে, তবে আলিঙ্গনের উপযুক্ত হয়ে যায়। কেননা তার ব্যক্তিসত্তার সাথে তো কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপদ্ধতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দেখুন। যে মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা রাযি. এর কলিজা বের করে কাচা চিবিয়েছে অর্থাৎ হযরত হিন্দা রাযি. এবং যে এটার কারণ হয়েছে অর্থাৎ হযরত ওয়াহশী রাযি. যখন তাঁরা দুজন ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করলেন এবং ইসলাম কবূল করলেন, তখন তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুসলমান ভাই ও বোন হয়ে গেলেন। এখন হযরত ওয়াহশীর নামের সাথে رَضِىَ اللهُ عَنْهُ লেখা হয়। হিন্দা যিনি কলিজা চিবিয়েছিলেন তাঁর নামের সাথে رَضِىَ اللهُ عَنْهَا লেখা হয়।

আসল কথা হল তাঁদের ব্যক্তিসত্তার সাথে তো কোন বিদ্বেষ ছিল না বরং তাঁদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। আর যখন ঐ মন্দ বিশ্বাস ও মন্দকর্ম খতম হয়ে গেছে তো এখন তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণের প্রশ্নই আসে না।

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর একটি ঘটনা

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর যুগের একজন বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ.। হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. "সূফী" হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর হাকীম ছাহেব রহ. বড় আলেম, "মুফতী" ও "ফকীহ" হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদিকে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. 'সামা' কে জায়িয মনে করতেন। বহু সংখ্যক সূফীদের নিকট সামার প্রচলন ছিল। 'সামার' মর্ম হল হল: বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত হামদ-নাত ইত্যাদি ভালো বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা

সুর সহ অথবা সুর ছাড়া শুধুমাত্র সুললিতকণ্ঠে কারো বলা আর অন্যান্যদের সেটা ভক্তি ও মহব্বতসহ শোনা।

অনেক সূফী হযরত এটাকে জায়িয মনে করতেন এবং এর অনুমতি দিতেন। আবার অনেক ফকীহ ও মুফতী ছাহেবগণ এ সামা কেও জায়িয মনে করতেন না বরং বিদআত আখ্যায়িত করতেন।

হাকীম মাওলানা যিয়াউদ্দীন ছাহেবও রহ. "সামা" নাজায়িয হওয়ার ফতওয়া দিয়েছিলেন। এদিকে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. "সামা" শুনতেন। যখন মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হল, তখন হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আগমন করলেন এবং এ সংবাদ পাঠালেন যে, ভিতরে গিয়ে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. এর নিকট আরয করা হোক যে, নিযামুদ্দীন খেদমতে হাযির হয়েছেন। ভিতর হতে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. উত্তর পাঠালেন যে, তাঁকে বাইরে আটকে দেয়া হোক। আমি মরার সময় কোন বিদআতীর চেহারা দেখতে চাইনা।

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. উত্তর পাঠালেন যে, তাঁর সামনে আরয করা হোক বিদআতী বিদআত থেকে তাওবা করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছে।

এটা শোনামাত্রই হাকীম যিয়াউদ্দীন রহ. নিজের পাগড়ী পাঠালেন যে, এটা বিছিয়ে এর উপর জুতা পায়ে দিয়ে যেন খাজা ছাহেব আগমন করেন। খালি পায়ে না আসেন। খাজা ছাহেব রহ. পাগড়ী উঠিয়ে মাথায় রাখলেন আর বললেন যে, এটা আমার জন্য দস্তারে ফযীলত। এ অবস্থাতেই তিনি ভিতরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এসে মুসাফাহা করলেন ও বসে গেলেন এবং হাকীম মাওলানা যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ. এর প্রতি মনোযোগী হলেন।

পরবর্তীতে খাজা ছাহেবের রহ. উপস্থিতিতে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেবের রহ. ইন্তিকালের মুহূর্ত চলে আসে। খাজা ছাহেব রহ. বলেন,

আলহামদুলিল্লাহ হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেবকে আল্লাহ তাআলা কবূল করে নিয়েছেন। খুব ভালো অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে।

তাহলে দেখুন, সামান্য সময় পূর্বে অবস্থা এমন ছিল যে, চেহারা দেখাও বরদাশত করতে পারছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই বলছেন যে, আমার পাগড়ীর উপর পা রেখে তাশরীফ রাখুন।

গোস্বা যেন আল্লাহর জন্য হয়

যাই হোক, যে গোস্বা বা বিদ্বেষ আল্লাহর জন্য হয় সেটা কখনো ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করেনা। পয়দা করে না কোন ফিতনা। কেননা যার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, যার উপর গোস্বা করা হয় সেও জানে যে, আমার সাথে তার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। বরং বিশেষ কাজ ও বিশেষ চিন্তাধারার সাথে মতপার্থক্য। এজন্য কেউ তার কথাকে খারাপ মনে করে না। কেননা সবাই জানে যে, তিনি যা কিছু বলছেন আল্লাহর জন্য বলছেন।

এটাকেই বলা হয়েছে مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ অর্থাৎ যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করে। তো এটা গোস্বার উত্তম ক্ষেত্র। শর্ত হল এই গোস্বাটা শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ নেয়ামত আমাদেরকে দান করুন। আমাদের ভালোবাসাও যেন আল্লাহর জন্য হয় আবার আমাদের বিদ্বেষও যেন একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য হয়।

কিন্তু এই গোস্বার মুখে যেন লাগাম পরানো থাকে। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর জন্য গোস্বা করা দরকার, সেখানে করবে আর যেখানে গোস্বা করা উচিত নয় সেখানে লাগাম টেনে ধরতে হবে।

হযরত আলী রাযি. এর ঘটনা

হযরত আলী রাযি. কে দেখুন। এক ইয়াহুদী তাঁর সামনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে কোন বেআদবীমূলক কথা বলে ফেলেছে। নাউযুবিল্লাহ। হযরত আলী রাযি. কি আর এটা সহ্য

করতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে উপরে উঠিয়েছেন এরপর মাটিতে আছড়ে ফেলে বুকের উপর উঠে বসেছেন। ইয়াহুদী যখন দেখল যে, তার আর বাঁচার কোন পথ নেই, তখন সে শুয়ে শুয়ে হযরত আলী রাযি. এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী রাযি. ঐ ইয়াহুদীকে ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে গেলেন।

লোকেরা বলল! হযরত! সে তো আরো বড় গোস্তাখীর কাজ করল। কেননা সে আপনার মুখে থুথু দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি তাকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেলেন কেন? হযরত আলী রাযি. বললেন: আসল কথা হল, প্রথমে যখন আমি তার উপর আক্রমণ করলাম তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে হত্যা করা। যেটা আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতে করেছি। কেননা সে নবীজীর শানে গোস্তাখী করেছে। যদ্দরুন আমার গোস্বা এসেছে এবং আমি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু যখন সে আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল, তখন আমার আরো বেশি গোস্বা আসল। কিন্তু তখন যদি আমি গোস্বার উপর আমল করে তার থেকে বদলা বা প্রতিশোধ নিতাম, তাহলে সেটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য হত না বরং আমার নিজের জন্য হত। এবং সেটা এ জন্যই হত যেহেতু সে আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে। তাই আমি তাকে আরো বেশি মারব! তো এ অবস্থায় এ রাগ আল্লাহর জন্য হত না বরং নিজের জন্য হত, এজন্য তাকে ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে গেছি।

মূলত এটা হল ঐ হাদীসে পাকের উপর আমল যেখানে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ

"যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ও আল্লাহরই জন্য রাগ করে।"[৭৬]

কেমন যেন সে গোস্বার মুখে লাগাম লাগিয়ে রেখেছে যে, যে পর্যন্ত গোস্বার শরয়ী ও বৈধ সীমারেখা, সে পর্যন্ত গোস্বা করা তো জায়িয।

---

৭৬. সুনানে আবূ দাউদ

কিন্তু যেখানে গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র শেষ, সেখানে তার থেকে গোস্বা এমনভাবে দূর হয়ে যাবে যে, কেমন যেন তার সাথে কোন সম্পর্কই নেই। এমন মানুষের ব্যাপারেই বলা হয়:

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ

অর্থাৎ "তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার সামনে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতেন।"[৭৭]

হযরত ফারূকে আযম রাযি. এর ঘটনা

একবার হযরত ফারূকে আযম রাযি. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রাযি. এর বাসার নল মসজিদে নববীর দিকে লাগানো। বৃষ্টির পানি মসজিদে নববীতে পড়ছিল।

হযরত উমর ফারূক রাযি. চিন্তা করলেন যে, মসজিদ তো আল্লাহ তাআলার ঘর। আর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বাসার নলের পানি মসজিদে এসে পড়ছে। এটা তো মহান আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ। ফলে তিনি ঐ নল ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। গোস্বার কারণেই তা ভেঙ্গে দিলেন। আর গোস্বা আসার কারণ হল মসজিদের আহকাম ও আদাবের বিরুদ্ধাচরণ। যখন হযরত আব্বাস রাযি. জানতে পারলেন যে, তার ঘরের নল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, তখন হযরত উমর ফারূক রাযি. এর নিকটে আসলেন এবং বললেন যে, আপনি এ নল কেন ভেঙ্গে দিয়েছেন? হযরত ফারূক আযম রাযি. বললেন যে, এটা তো মসজিদের স্থান। কারো ব্যক্তিগত স্থান নয়। মসজিদের স্থানে কারো ব্যক্তিগত নল শরীয়তের বিধান পরিপন্থী কাজ ছিল। এজন্য আমি ভেঙ্গে দিয়েছি।

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন: আপনি জানেন কি এ নল কিভাবে লাগানো হয়েছে? এ নল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে লাগানো হয়েছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ নির্দেশে আমি লাগিয়েছিলাম। আপনি এটা ভাঙ্গার কে?

---

৭৭. সুনানে আবূ দাউদ, ঈমান বাড়ে ও কমে অধ্যায়, হাদীস নং ৪৬৮১

হযরত ফারূকে আযম রাযি. বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন? হযরত আব্বাস রাযি. বললেন: হ্যাঁ, অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন হযরত ফারূকে আযম রাযি. হযরত আব্বাস রাযি. কে বললেন: আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাথে আসুন। ফলশ্রুতিতে ঐ নলের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে হযরত ফারূকে আযম রাযি. রুকুর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হযরত আব্বাস রাযি. কে বললেন যে, আপনি আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার এ নল স্থাপন করুন। হযরত আব্বাস রাযি. বললেন: আমি অন্য কারো দ্বারা লাগিয়ে নিব। হযরত ফারূকে আযম রাযি. বললেন: উমরের এত বড় দুঃসাহস যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক লাগানো নল ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার দ্বারা এত বড় অন্যায় হয়ে গেল। এটার ন্যূনতম শাস্তি এটাই যে, আমি রূকু অবস্থায় থাকব আর আপনি আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে এ নল স্থাপন করবেন। ফলশ্রুতিতে হযরত আব্বাস রাযি. তাঁর কোমরের উপর দাঁড়িয়ে সেই নল পুনঃস্থাপন করলেন। সেই নলটি আজো মসজিদে নববীতে লাগানো আছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন। যাঁরা মসজিদে নববী নির্মাণ করেছেন, তাঁরা এখনো সেই নলটি ঐ স্থানেই লাগিয়ে দিয়েছেন। যদিও বর্তমানে এই নলের বাহ্যত কোন ব্যবহার নেই। কিন্তু স্মারক হিসেবে লাগানো আছে।

এটা হল বাস্তবিক পক্ষে ঐ হাদীসের উপর আমল যে مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ অর্থাৎ "যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসল ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখল"।[৭৮]

প্রথমে যে গোস্বা ছিল সেটাও আল্লাহর জন্য ছিল আর এখন যে মহব্বত বা ভালোবাসা সেটাও আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি এ কাজটি করল, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল। এটা ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার লক্ষণ।

---

৭৮. সুনানে আবূ দাউদ, অধ্যায় ঈমান বাড়ে ও কমে, হাদীস নং ৪৬৮১

কৃত্রিম গোস্বা করে বকা দিবেন

যাই হোক, এই بُغْضٌ فِى اللهِ (বা আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ) এর কারণে অনেক সময় গোস্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়। বিশেষ করে ঐসব মানুষের উপর গোস্বা প্রকাশ করতে হয় যারা কারো তারবিয়্যতের অধীনে হয়। যেমন শিক্ষককে তাঁর ছাত্রের উপর গোস্বা করতে হয়। পিতাকে সন্তানের উপর, শাইখকে মুরীদের উপর গোস্বা করতে হয়। কিন্তু এই গোস্বা ঐ সীমারেখা পর্যন্ত হওয়া উচিত, যতটুকু ইসলাহের জন্য জরূরী, এর থেকে আগে বাড়বে না। যেমনটি এইমাত্র আরয করা হয়েছে যে, এর পদ্ধতি হল এই যে, যদি কেউ অতিমাত্রায় উত্তেজিত থাকে তাহলে গোস্বা করবে না। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষকের ছাত্রের উপর গোস্বা এসে গেল, তাহলে এই গোস্বার হালতে বকাঝকা এবং মারপিট করবে না বরং সেই রাগ বা গোস্বা খতম হওয়ার পর এবং উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর কৃত্রিম গোস্বা করে বকাঝকা করবে। যাতে করে এই বকাঝকা সীমার বাইরে চলে না যায়। এই কাজ একটু কঠিন। কেননা মানুষ গোস্বার সময় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এর মশক বা চর্চা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গোস্বার ক্ষতি ও অনিষ্টতা হতে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

ছোটদের উপর বাড়াবাড়ির ফলাফল

যারা তারবিয়্যতের অধীনে আছেন। যেমন ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রী, মুরীদ- প্রমুখ এদের উপর গোস্বার সময় সীমালংঘন হয়ে গেলে অনেক সময় ব্যাপারটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কেননা যার উপর গোস্বা করা হচ্ছে, যদি তিনি আপনার থেকে কোন দিক দিয়ে বড় হন বা সমান হন, তাহলে আপনি গোস্বা করার কারণে তার মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে তিনি সেটা প্রকাশও করে দিবেন এবং তিনি বলে দিবেন যে, তোমার একথা বা কাজ আমার ভালো লাগেনি অথবা কমপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে নিবে। কিন্তু যে আপনার ছোট বা অধীনস্ত সে আপনার থেকে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম নয় বরং স্বীয় অসন্তুষ্টি

প্রকাশের উপরও সক্ষম নয়। তাইতো কোন ছেলে তার পিতাকে বা ছাত্র তার শিক্ষককে বা মুরীদ তার শাইখকে বা পীরকে এটা বলবে না যে, আপনি অমুক সময় যে কথা বলেছিলেন তা আমার পছন্দ হয়নি। কেননা আপনার তো জানাই নাই যে, আপনি ঐ ছোট মানুষের অন্তরে কী পরিমাণ আঘাত দিয়েছেন আর যখন খবরই নাই, তো ক্ষমা চাওয়াও সহজ হবে না।

এজন্য এটা অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি ব্যাপার। বিশেষত যারা ছোট্ট শিশুদেরকে পাঠদান করেন, তাঁদের ব্যাপারে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন যে, এদের ব্যাপার তো খুবই নাযুক ও স্পর্শকাতর। কেননা এরা তো অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যাপার হল এই যে, যদি তারা ক্ষমাও করে দেয় তবুও ক্ষমা হয়না। কেননা তাদের ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা

যাই হোক, আজকের মজলিসের সারকথা হচ্ছে এই যে, নিজের গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে। কেননা এই গোস্বা অসংখ্য খারাবীর মূল। আর এর দ্বারা অগণিত অভ্যন্তরীণ ব্যাধি সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তো এ চেষ্টা করবে যেন গোস্বার বহিঃপ্রকাশই না হয়। পরবর্তীতে যখন এই গোস্বা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, তখন দেখবে কোথায় গোস্বা করা যায় আর কোথায় গোস্বা করা যায় না। যেখানে গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র আছে, ব্যস সেখানে জায়িয সীমারেখা পর্যন্ত গোস্বা করবে, এর থেকে বেশি করবে না।

গোস্বার ভুল ব্যবহার

যেমনটি এইমাত্র আমি বললাম যে بُغْضٌ فِى اللهِ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য গোস্বা করা উচিত। কিন্তু অনেক মানুষ এটার চরম অপব্যবহার করে। তাইতো মুখে মুখে তো বলে যে, আমার এই গোস্বা আল্লাহর জন্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ গোস্বা অহংকার এবং অন্যকে ছোট মনে

করার কারণে হয়। উদাহরণস্বরূপ মহান আল্লাহ দ্বীনের উপর সামান্য চলার তাউফীক দান করলে কেউ কেউ সারা দুনিয়ার মানুষকে হীন ও নীচু মনে করতে থাকে। আমার পিতাও নীচু, আমার মাতাও নীচু, আমার ভাইও নীচু, আমার বোনও নীচু, আমার বাসার সমস্ত সদস্য নীচু। ব্যস সবাইকে নীচু মনে করা আরম্ভ করে দিয়েছে। আর মনে করছে যে, এরা সবাই জাহান্নামী! একমাত্র আমিই জান্নাতী! আমাকে আল্লাহ তাআলা এই জাহান্নামীদের ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন!!

এখন তাদের ইসলাহের জন্য তাদের উপর গোস্বা করা, তাদের জন্য অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করা, তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং তাদের হক নষ্ট করা আরম্ভ করে দিয়েছে। আর এরপর শয়তান তাকে এ সবক পড়ায় যে, আমি যা কিছু করছি এটা "আল্লাহর জন্য দুশমনী"র অধীনে করছি।

অথচ বাস্তবিকপক্ষে এসব কিছু নিজের নফসের চাহিদা অনুযায়ী করছে। তাইতো যারা দ্বীনের উপর নতুন নতুন চলেন শয়তান তাদেরকে এমনভাবে ধোঁকা দেয় যে, তাদেরকে بُغْضٌ فِى اللهِ বা আল্লাহর জন্য বিদ্বেষের সবক পড়িয়ে তার মাধ্যমে অন্যান্য মুসলমানদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করায়। যদ্দরূন পরস্পরের লড়াই, ঝগড়া ও ফাসাদ হয়। কথায় কথায় মানুষের উপর গোস্বা করে। সামান্য সামান্য কারণে মানুষকে গালমন্দ করে। যদ্দরূন ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর একটি কথা

হযরাতুল আল্লাম মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর একটি কথা সব সময় মনে রাখার মত। তিনি বলতেন: হক কথা, হক নিয়্যতে, হক পদ্ধতিতে বলা হলে সেটা কখনো প্রতিক্রিয়াবিহীন থাকে না। এবং এর দ্বারা কখনো ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হয় না। কেমন যেন হযরত তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। ১. কথা হক হবে, ২. নিয়্যত হক হবে, ৩. পদ্ধতি হক হবে। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি কোন খারাপ

কাজে লিপ্ত। এখন যদি কেউ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে, নরমভাবে, স্নেহের সাথে তাকে বুঝায়, যাতে করে সে ঐ খারাপ কাজ পরিত্যাগ করতে পারে। এই নিয়্যত থাকে। নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য না হয় কিংবা অন্যকে ছোট করাও উদ্দেশ্য না থাকে। আর পদ্ধতিও হক থাকে অর্থাৎ নম্রতার সাথে স্নেহ-ভালোবাসামিশ্রিত কণ্ঠে কথা বলে, যদি এ তিনটি শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে সাধারণত ফিতনা হয় না।

আর যদি কোথাও এমন দেখা যায় যে, হক কথা বলার কারণে ফিতনা দাঁড়িয়ে গেছে, তাহলে প্রবল ধারণা এটাই যে, এর কারণ হল ঐ তিনটি শর্তের মধ্যে কোন শর্ত ছুটে গেছে। হয়ত কথা হক ছিল না অথবা নিয়্যত হক ছিল না, অথবা পদ্ধতি হক ছিল না।

তোমরা খোদায়ী ফৌজদার নও

এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, আমরা খোদায়ী ফৌজদার বা সেনাপতি হয়ে দুনিয়াতে আসিনি। আমাদের কাজ শুধু এতটুকুই যে, হক কথা, হক নিয়্যত ও হক পদ্ধতিতে অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। মুনাসিব বা উপযুক্ত পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে পৌঁছাতে থাকা। এ কাজে কখনো বিরক্ত হওয়া যাবে না। অবশ্য এমন কোন কাজও করা যাবে না, যার দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি হয়।

মহান আল্লাহ নিজ রহমতে এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাউফীক দান করেন। আমীন।

وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. বড়দের ছেলেবেলা
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. ইসলাহী মাজালিস (২য় খণ্ড)
৮. মাজালিসে আবরার
৯. রাসায়েলে আবরার
১০. বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. আহকামে সফর
১৪. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
১৫. বিনয় ও তাওবা: মুমিনের অপরহার্য দুটি গুণ
১৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৭. তোমারই কুদরত দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৮. মালফূযাতে ফুলপুরী
১৯. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত
২০. রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নূরের তৈরী?
২১. মালফূযাতে রায়পুরী
২২. আত তাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২৩. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী
২৪. মাজালিসে সিদ্দীক
২৫. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
২৬. ধূম্রজালে জিহাদ
২৭. মালফূযাতে ফকীহুল উম্মাত
২৮. আহকামে হজ্ব
২৯. আহকামে ইতিকাফ
৩০. মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত